শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

পৌষ-মাঘ ১৪২১ ● জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ● রবিউল আওয়াল-রবিউস সানি ১৪৩৬

খবরে আল-আমীন মিশন: ১৯৯৮—২০১৪

- একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০৮.১৯৯৮
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে চলেছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দমেলা, ০১.০৩.২০০০
- বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ। —আবদুর রাউফ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.১২.২০০০
- বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। —বাহারউদ্দিন, আজকাল (রবিবাসর), ১৮.১১.২০০১
- দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান। —মিলন দত্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০২.২০০২
- Mainstream reform from within –Madhumita Bhattacharya, The Telegraph, 10.09.2002
- একটি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা, নবজীবনের প্রবেশ পথ। —একরাম আলি, আজকাল, ০৪.০৪.২০০৩
- Merit Explodes Madrasah myths –Sunanda Sarkar, The Telegraph, 28.07.2003
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। —সম্পাদকীয়, কালান্তর, ০৯.০৮.২০০৩
- ইচ্ছে হাওয়ায়। —কবীর সুমন, আজকাল, ১৭.০৭.২০০৪
- Flying Colours –Md. Shafi Shamsi, The Indian Express, 02.06.2005
- Al-Amin Way: The Real Alternative to Reservation –Arindam Chowdhury, Business & Economy (Editorial), 26.08.2005
- ধর্ম, সমাজ, ঘেরাটোপ— ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.২০০৫
- School Bells Echo Amidst Paddy Fields: Al-Ameen Mission has today become a model for excellent education standards. –Islamic Voice, February 2006
- Hope for Hopeless: It's school that gives those children a chance who have not a penny of their name– Nisha Lahiri, The Telegraph, 02.06.2006
- রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার নবজাগরণ। —অঞ্জন বসু, সংবাদ প্রতিদিন, ০৩.০২.২০০৭
- আল-আমীন মিশন—প্রতিশ্রুতির অন্য নাম। —এস. এম. সামসুদ্দিন, একদিন, ০২.০৩.২০০৭
- মূল স্রোতে। —সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০৫.২০০৭
- Mission Launchpad for poor student –Jhimli Mukherjee, The Times of India, 01.06.2007
- আল-আমীনের সাফল্য: আত্মশক্তিতে ভরপুর বাঙালি মুসলমানরা।— শেখ ইবাদুল ইসলাম, একদিন, ০১.০৬.২০০৭
- আল-আমীন মিশন: স্বপ্ন পূরণের মাইল ফলক। —মহ. সাদউদ্দিন, কালান্তর (রবিবারের পাতা), ১০.০৬.২০০৭
- Sustained by Donations, Al-Ameen Mission is providing mainstream learning to the community's children. Rajdeep Datta Roy, Live mint.com, The Wall Street Journal, 18.12.2007
- Mission Possible: It has scripted many a turnaround: Picking up poor kids, tutoring them and seeing them off on the road of success. –Jayanta Gupta & Subhro Maitra, The Times of India, 30.04.2008
- Deprived kids blaze trail of glory: House of dreams. The Al-Ameen Mission has been nurturing talent from underprivileged Muslim Families. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 28.05.2010
- Al-Ameen Mission-Shelter & Studies. –Bibhas Bhattacharyya, Hindusthan Times, 23.06.2010
- গৌরব, লজ্জা— সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৫.২০১২
- A mission that changes lives, helps dreams soar. –The Times of India, 28.05.2013
- নতুন তারার জন্ম আল-আমিনে। —কৌশিক সরকার, এই সময়, ০৪.০৬.২০১৩
- One Mission, hundreds of success stories –The Times of India, 04.06.2013.
- Al-Ameen Students score big in medical. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 07.06.2013
- জয়েন্টেও মিশন সফল আল আমিনের। —অনির্বাণ ঘোষ, এই সময়, ০৯.০৬.২০১৩
- সমাজের অন্দর থেকে। —তাজুদ্দিন আহ্‌মেদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০৯.২০১৩
- আল-আমীন মিশন এক মরূদ্যান, এক অনুঘটক। —একরামূল হক শেখ, স্বভূমি, ০৯.০৩.২০১৪
- দারিদ্র্য জয় করে উজ্জ্বল আল-আমীন মিশন। —সোমনাথ মণ্ডল, আজকাল, ৩১.০৫.২০১৪

আল-আমীন বার্তা

পৌষ-মাঘ ১৪২১ • জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫ • রবিউল আওয়াল-রবিউস সানি ১৪৩৬ । পঞ্চম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

দিনগুলি রাতগুলি

রোহণ কুদ্দুস
আমার মিশন মিশনের আমি ০৯

পথিকৃৎ

সেলিম মল্লিক
প্যারীচাঁদ ১৪

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

আসাদুল ইসলাম
হার না মানা এক জীবন ১৯

স্মরণ

সাবির আলি
বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা ও খানবাহাদুর তামিজ খাঁ ২৪

মুক্তভাষ

ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ
মৌচাকে গুপ্তচর ২৮

ফিরে দেখা

ফজিলতুননেসা জোহা
মুসলিম নারীর মুক্তি ৩৪

হাজার দুয়ারি

মহম্মদ মহসীন আলি
অন্য আরও পঠনপাঠন ৩৬

বিশ্ববিচিত্রা

ফরিদা নাসরিন
প্রাচীনতম বাসস্থান । জেব্রা । ক্রিকেট ৪১

আরও লেখা

বাণী ০৩
পাঠকনামা ০৪
সম্পাদকীয় ০৫
মিশন সমাচার ০৬
শিখরদেশ ৩১
আমার বাড়ি আল-আমীন ৪৪
আমাদের পাতা ৪৬

মুদ্রণ বিবরণী

পরামর্শ পরিষদ

ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক

এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক

শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ

মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ

আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স

মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক সেন্ট্রাল অফিস ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯; ৩২৯৭ ৩৫৮০
ফ্যাক্স ৯১৩৩ ২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

— আল-কোরআন, সুরা আনআম, আয়াত ১৪১ (অংশ)

আবদাহ্ ইবনে সালামা (র.) থেকে বর্ণিত— নবি করিম (স.) বলেছেন, দান না করে গুনে গুনে কোনো কিছু সঞ্চয় করে রেখো না। তাহলে মহান আল্লাহ্ও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

— সহিহ্ বোখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ১৩৫০

সম্প্রীতির জ্বলন্ত উদাহরণ

৪৮.৪ শতাংশ মেয়ে মনে করে যে, তারা পুত্রসন্তান হয়ে জন্মালে ভালো হত: মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ২০০৭-এর তথ্য। এইরকম পরিস্থিতিতে 'আল-আমীন বার্তা'র সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় 'কিংবদন্তি' বিভাগে শাকিলা সেখ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র নাম সই করতে জানা একজন মহিলা যদি নিজেকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করতে পারেন, ফর্মুলা না জেনেও জীবনসংগ্রামে নিজেকে কোলাজ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে গত কুড়ি বছরে দু-কোটি কন্যাকে কেন মায়ের গর্ভেই মেরে ফেলা হয়েছে? কেন তাদের দুর্বল ভাবা হয়? কেনই-বা কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে শ্বশুরবাড়িতে বউমার গুরুত্ব কমে যায়? শিল্পের দক্ষতাগুণে প্রাপ্ত স্কলারশিপে অভাবের সংসারে শাকিলা সেখ এনে দিয়েছেন গতি। তবে কেন একটি পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত গৃহিণীকে একের পর এক প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়?

আরেকটি কারণেও ডিসেম্বর সংখ্যার কিংবদন্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। এখন পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবনতির দিকে। মানুষ মানুষকে বিচার করছে ধর্মীয় পরিচয়ের মাপকাঠির সূচকে। সারা দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের রবীন্দ্র-নজরুলের এই বাংলাতেও হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের মতো ভয়ংকর পরিস্থিতিতে শাকিলা সেখের 'বাবা' বলদেব রাজ পানেসর পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে সম্প্রীতির এক জ্বলন্ত উদাহরণ এবং সেইসঙ্গে সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শাকিলা সেখ এবং তাঁর বাবা পানেসরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একরাম আলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাদা রেশমের মতো চুল-বিশিষ্ট ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ননীদাদুর (ননীগোপাল চৌধুরী) চেহারাটা। আমরা আল-আমীন মিশনের সন্তানেরা তাঁকে দাদু বলেই ডাকি। আজ আল-আমীন মিশনকে উন্নতির শিখরে পৌঁছোনোর পিছনে ননীদাদুর ভূমিকা ভোলার নয়।

জাভেদ ইকবাল
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ।

কায়রুয়ান ও তক্ষশীলা

'আল-আমীন বার্তা'র তিনটি সংখ্যা (মার্চ ২০১৪, মে-জুন ২০১৪ ও জুলাই-আগস্ট ২০১৪) হাতে পেয়ে খুশি হয়েছি। খুঁটিয়ে পড়েছি। মনোরম পত্রিকা। জানতে পারা গেল মিশনের পক্ষ থেকে সম্প্রদায়ের মধ্য হতে মানুষ গড়ার কীরকম নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। মিশনের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠা প্রাক্তনীদের কাহিনিও স্থান পেয়েছে পত্রিকাতে। যাই হোক, সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিকভাবে শিক্ষিত করার প্রয়াস-সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি পত্রিকাটিতে স্থান পাচ্ছে, এটা আনন্দের কথা।

পত্রিকাতে স্থান পাওয়া ফাতিমা আল-ফিহ্‌রি ও আল-জাহ্‌রাবিকে নিয়ে প্রবন্ধগুলোও পড়েছি মন দিয়ে। আরবভূমি হতে চয়ন করা মুসলমান ব্যক্তিত্বদের খোঁজা কেন? হাবিব রহমান কর্তৃক সংগৃহীত বিগত শতাব্দীর ফজিলতুননেসা জোহার লেখা থেকে উদ্ধৃত করে বলি, "সেই রকম ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ভারতবাসী— অন্য পরিচয়ে তাহাদের গর্ব করিবার কিছুই নাই বরং লজ্জার বিষয় আছে। ভারতবাসী মাত্রই তাহাদের আপনজন। এই শিক্ষা তাহাদের বিশেষভাবে পাইতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম বড়ো জিনিস হইলেও জাতীয় জীবনে তাহা সবচেয়ে কাম্যবস্তু নয়।" আমাদের দেশের সবারই শ্লাঘার বিষয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই খ্রিস্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ নানারকম চুয়ান্নটি বিষয়ে পঠনপাঠন হত। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দশ হাজার পাঁচশোর মতো ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে চাণক্য, চরক, জীবক প্রভৃতি মহাপণ্ডিত ও চিকিৎসক প্রমুখ পড়েন। আর তাঁদের খ্যাতি জগৎজোড়া, এ-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তক্ষশীলা কিংবা পঞ্চম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তো তিউনিশিয়ার আল-কারাউয়িন বা কায়রুয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহু প্রাচীন এবং খ্যাতিতে অতুলনীয়। তাহলে তিউনিশিয়ার কায়রুয়ান খুঁজতে যাওয়া কেন?

মহম্মদ আমীর হোসেন
কাজী নজরুল ইসলাম সরণি, কলকাতা ৭০০ ০৫২।

সম্পাদকের উত্তর

'কায়রুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়'টিকে 'খুঁজতে যাওয়া'র উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। আমাদের অভিজ্ঞতা এরকম যে, পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে শিক্ষা সম্বন্ধে— আত্মবিশ্বাসহীন। তাই দেশগঠনে, শিক্ষায় ও উন্নত কর্মে তারাও যে যুক্ত হতে পারে এবং হওয়া উচিত— এই মনটি তৈরি করাই প্রথম কাজ। আর, সেটির নির্মাণপ্রয়াসে 'আল-আমীন বার্তা' অতীত থেকে মুসলমানদের উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস ও দর্শনচর্চার— মোটকথা বৌদ্ধিক চর্চার বিবরণ প্রতি সংখ্যায় সাধ্যমতো দিয়ে যাচ্ছে। এসবের একটাই উদ্দেশ্য, আগেই বলা হয়েছে— রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস জাগানো, যে, শুধু ধর্মপালনই নয়, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়ও তোমার। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, দরিদ্রমুক্ত, অত্যাধুনিক যে-পৃথিবীর স্বপ্ন মানুষ দেখে, তেমন একটি পৃথিবী তৈরিতে তোমারও মেধা আর শ্রম জরুরি। চেষ্টা করলে তুমিও পার। যদি আমরা সেই আত্মবিশ্বাসটুকু জাগাতে পারি, তাহলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যায়।

আর তক্ষশীলা বা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সাক্ষর বাঙালি মাত্রেই জানেন। কেননা, প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকেই সেসব গৌরবকথা আছে। কিন্তু কায়রুয়ান সম্বন্ধে ক-জনই-বা জানেন? বা 'আল-আমীন বার্তা'য় প্রকাশিত ইতালির বেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনত্ব সমন্ধে?

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার নবজাগরণ কালের একটি বিশিষ্ট নাম। আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চুলচেরা বিশ্লেষণ করি, এমন অনেক সূত্র পাব, তাতে মনে হতেই পারে— এ-নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বাঙালিরই এবং হিন্দু সমাজকে নতুন এক পথের দিশা দেখিয়েছিল। সর্বস্তরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সমাজটিকে জাগ্রত করেছিল তো বটেই, হাজার বছরের অচলায়তনেই ধাক্কা দিয়েছিল। যাঁরা এই কাজটি করেছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র সেই দলের উজ্জ্বল সদস্য। বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক, সমাজসংস্কারক— আরও অনেক দুর্লভ বিশেষণই তাঁর নামের আগে বসে। এমনই একজন মনীষী সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিবন্ধ থাকছে এই সংখ্যায়। উদ্দেশ্য হল— জন্মের দ্বিশতবর্ষে প্যারীচাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন।

কিন্তু, ওই যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নবজাগরণপর্বটিকে দেখা— তার কী হবে? শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালির উন্নতিই কি সমগ্র বাঙালি জাতির উন্নতি? না, আমরা তেমনটা মনে করি না। কিন্তু এমনও মনে করি না যে, উনিশ শতকের নবজাগরণ শুধুই হিন্দু বাঙালির দ্বারা এবং হিন্দু বাঙালির জন্য সংঘটিত হয়েছিল। কেন মনে করি না?

স্রোত যখন বয়, সে-স্রোত বিশেষ কোনো ধর্মমতে পবিত্র হলেও অন্য ধর্মমতাবলম্বীরাও সেই স্রোতে অবগাহন করে। সাংসারিক প্রয়োজনে সেই স্রোতের জল তাদেরও কাজে লাগে। তখন তা নিছক পানি হলেও শরীর স্নাত, শীতল এবং পরিষ্কার হয়। নবজাগরণের ঢেউ মুসলমান বাঙালির তেমনই উপকার সাধন করেছে। আর তাই, পরোক্ষে হলেও, উনিশ শতকে বাঙালির রেনেসাঁ মুসলমান বাঙালিকেও নবভাবে উজ্জীবিত করেছে। প্যারীচাঁদ-পরবর্তী গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন বাঙালি পেয়েছে, তেমনই পেয়েছে মীর মশাররফ হোসেনকেও। 'আনন্দমঠ' যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনই পেয়েছি 'বিষাদ সিন্ধু'। আর তাই প্যারীচাঁদ-স্মরণ। কেননা, তিনিই কথ্যভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের পথিকৃৎ।

আল-আমীন মিশন উনতিরিশ বছরে পদক্ষেপ করল। বাংলায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সময়টুকু হয়তো তেমন গর্বের নয়। কিন্তু, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শুরু হয়েছিল একদিন এবং এত স্বল্প সময়ে দ্রুতবিস্তারে আজ সারা বাংলায় যার বিয়াল্লিশটি শাখা, সেইসঙ্গে বাংলার বাইরে আরও দুটি, বিশেষ উদ্দেশ্যবাহিত এমন বিস্তারলাভের গর্ব প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যতিক্রমী করেছে।

উদ্দেশ্যটি কী? বাংলার পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার। দুঃস্থজনে শিক্ষাদান। আজ ন-হাজারের বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রী আল-আমীনের শাখাগুলোতে শিক্ষণরত। কেমন শিক্ষা? যে-শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞানের পিপাসা যেমন বৃদ্ধি পায়, দেশচেতনা যেমন জন্মায়, উচ্চমানের জীবনযাপনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তেমনই যেন জাগে সংস্কৃতিচেতনা। আর সেই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হিসেবে 'আল-আমীন বার্তা'র প্রকাশ। কেননা, সংস্কৃতিহীন জাতি প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মপরিচয়হীন। সংস্কৃতিচর্চার এই গুণের দিকটি আমরা অবশ্যই বিস্মৃত হব না।

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়।
আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর।
এই বিভাগে থাকছে সেইসব কথা, সমাচার।

আল-আমীন উৎসব

উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ। ২৪ জানুয়ারি, খলতপুর।

এ-বছর আল-আমীন উৎসব অনুষ্ঠিত হল ২৪, ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১৫। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের সূচনাদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। পবিত্র কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেন সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম। সম্পাদকীয় ভাষণে এম নুরুল ইসলাম মিশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। মিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। এ-দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা। তাঁর বক্তব্যে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্কের ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) ও ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সফল ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষভাবে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন সকালে রক্তদান ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের শুভ সূচনা করেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। মিশনের আবাসিকসহ আশপাশের গ্রামবাসীরা রক্তদান শিবিরে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং অন্তত পাঁচ শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়। বিকেলের মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী। স্বাগত ভাষণে এম নুরুল ইসলাম মিশনের তিন দশকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুলতান আহমেদ মিশনের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে জানান যে, মিশন তার আদর্শে অবিচল থেকে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে এবং দরিদ্র-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উন্নত শিক্ষাদানে সফল হয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক, কবি ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রনির্মাতা সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, তাঁর বহু দিনের ইচ্ছা ছিল মিশনে আসার এবং এখানে এসে মিশনের পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের অভাবনীয় সাফল্যে তিনি তৃপ্ত। তিনি আরও বলেন, নানান ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যালঘু সমাজ আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আল-আমীন মিশনই পথপ্রদর্শক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চিত জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। আর-এক বিশেষ অতিথি পলিমার বিজ্ঞানী সুকুমার মাইতি বিজ্ঞানে ভারতের নানান সাফল্য তুলে ধরে মন্তব্য

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বলছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুরজিৎ দাশগুপ্ত। পাশে বিশিষ্ট পলিমার বিজ্ঞানী সুকুমার মাইতি। ২৫ জানুয়ারি, খলতপুর।

করেন যে, মিশনের এই সাফল্য আসলে মিশনের মেধাবান ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষাই পারে নবীন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এরই মাঝে এ-বছরের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারিণী আরসি হাসমাতকে মিশন পরিবারের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর হাতে সংবর্ধনা-উপহার তুলে দেন সাংসদ সুলতান আহমেদ। আরসি হাসমাত তাঁর প্রতিক্রিয়ায় মিশনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মিশনের এই শিক্ষা আন্দোলন একদিন সারা দেশেই উদাহরণযোগ্য হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঝাড়খণ্ড থেকে আগত রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক আহ্‌মদ সাজ্জাদ ও রাঁচির বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ডা. মাজিদ আলম।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনটি ছিল ২৬ জানুয়ারি। দিনটি সমগ্র স্বাধীন ভারতের কাছে প্রজাতন্ত্র দিবস। গত কয়েক বছর ধরে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়াদের কাছে ওই দিনটির আরও একটি ব্যঞ্জনা তৈরি হয়েছে— প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন দিন। বর্তমানের সঙ্গে প্রাক্তনের পরিচয় আর ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ত্রিদিবসীয় আল-আমীন উৎসব সত্যিকার উৎসব হয়ে ওঠে এই প্রজাতন্ত্র দিবসেই। আল-আমীন মিশনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী— যাঁরা চিকিৎসক হয়েছেন, তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে সারাদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির চলে। জেনারেল মেডিসিন, স্ত্রী-রোগ, নাক-কান-গলা বা দাঁতের রোগ— বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেন স্থানীয় মানুষজন, অভিভাবক-অভিভাবিকা থেকে মিশনের ছাত্রছাত্রীরা। ক্যাম্পাসের একদিকে যখন এই আয়োজন চলে, অন্যদিকে জমে ওঠে পুনর্মিলনের সভামঞ্চ। বাইরে থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথি নয়, এ-দিনের সভামঞ্চ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতেই। হাজিকুল আলম, তাহেরা খাতুন, মহম্মদ হাদীউজ্জামান, শহিদুল ইসলাম, কাজী আবেদুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, আনারুল হক প্রভৃতি একঝাঁক চিকিৎসকের পাশাপাশি যেমন ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক আয়াতুল্লা ফারুক বা ইঞ্জিনিয়ার আবুল ফারহা, রামিজ রাজারা ছিলেন, তেমনই ব্যবসায়ী মোরসেদ মোল্লা, সেখ আতাউর রহমানের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। উপস্থিত ছিলেন মিশনের কাজেই নিবেদিতপ্রাণ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। সাধারণ সম্পাদক

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছিল রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা।

রক্ত দিচ্ছে এক প্রাক্তন ছাত্রীও।

যখন মিশনের লড়াই, আল-আমীন মিশনের আল-আমীন মিশন হয়ে ওঠার কথা বলছেন, তখন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের লড়াই-সংগ্রাম, অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। তাহেরা খাতুন হাসপাতালের চাকরির পাশাপাশি মেডিকেল পড়ুয়াদের হস্টেলে সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে বুঝেছেন আল-আমীনের সুপারিনটেনডেন্টদের দায়িত্ব-ভালোবাসা কতটা প্রগাঢ়। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা যেন সেটা বোঝার চেষ্টা করে। আবুল ফারহা, রামিজ রাজা, আনারুল হক, শহিদুল ইসলামরা যখন বাধার পাহাড় টপকে সফল হওয়ার গল্প শুনিয়ে মোহিত করছেন ছাত্রছাত্রীদের, তখন অন্য চমক বয়ে এনেছেন মোরসেদ মোল্লা, আতাউর রহমানরা। আল-আমীন মিশন গড়ে তোলার পিছনে ব্যবসায়ী মানুষদের যে কতটা অবদান, তার আঁচ দিয়েছেন মোরসেদ। চিকিৎসক-ইঞ্জিনিয়ারদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও গৌরবজনক ভূমিকা পালন করতে পারেন সমাজের জন্য, তা প্রমাণিত হয়েছে মোরসেদ মোল্লা কর্তৃক মিশনকে তৃতীয় অ্যাম্বুলেন্স দান করা থেকেই। প্রতি বছর তিনি একেকটি শাখাকে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স দান করবেন, এমনটাই জানা গেল সভামঞ্চ থেকে। আর সব শেষে আতাউর রহমান সকলকে নির্বাক করে দিলেন তাঁর লড়াইয়ের গল্প শুনিয়ে। মিশনের সহযোগিতায় মিশনে আসার আগে মাঠে কাজ করে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। দিল্লিতে ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময়, পড়তে পড়তেই দোকান দিয়েছেন। কর্মজীবনে পনেরো দিনের মধ্যে কাজ না দেখাতে পারলে কাজ থাকবে না— কর্তৃপক্ষের এই ফরমান মাথায় নিয়ে কাজ করে এক হাজার কর্মীর মধ্যে বছরের সেরা কর্মী নির্বাচিত হয়েছেন। আল-আমীন না থাকলে আজ যে তিনি বছরে চল্লিশ বারের বেশি বিমানে যাতায়াত করছেন, তা সম্ভব হত না, তেমনি খুঁজে পেতেন না তাঁর আব্বাকে। হারিয়ে যাওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন তাঁর আব্বার কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে আতাউর আর কথা বলতে পারলেন না। বলতে পারলেন না তাঁর আব্বা আজ সম্পূর্ণ সুস্থ। উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে আতাউরের এই লড়াইকে শুধু সেলামই করলেন না, যখন চেয়ার ছাড়লেন প্রত্যেকের চোখের কোণ তখন ভেজা। আল-আমীন উৎসবের অনিন্দ্যসুন্দর সমাপ্তি মুহূর্তের রেশ ধরে রাখতে সভার সভাপতি দিলদার হোসেন প্রায় বিনা বাক্যেই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

উৎসবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন মিশনের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সাজ্জাদ হোসেন।

তিন দিনের এই আল-আমীন উৎসবের প্রতিদিনই বয়েজ ও গার্লস ক্যাম্পাসে আলাদা আলাদা সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা। কুইজ, আবৃত্তি, গান, নাটক ইত্যাদিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আল-আমীন উৎসব।

আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুরে বার্ষিক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর ক্যাম্পাসের বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সব চাইতে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যেমন খুশি সাজো। শেষ দিনের অনুষ্ঠানগুলি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন ক্যাম্পাসের ছাত্ররা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল তৈরি ও প্রদর্শনী করে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। কেরিয়ার বিষয়ক আলোচনা এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থাপনায় বিজ্ঞান সচেতনতা সভা সকলের কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ড. মানসপ্রতিম দাস ও ড. মেহেদি কালাম বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় তাঁদের মূল্যবান বক্তৃতা দেন। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় অভিভাবক সভা, সভায় মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দিলদার হোসেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম, ননীগোপাল চৌধুরী, মহম্মদ নাসির উদ্দিন, মহিউদ্দিন সরকার, ইউসুফ আলি মণ্ডল, ইউনুস সরদার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মিশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশ পায় ছাত্রদের লেখায় সমৃদ্ধ 'কারুবাকী' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা ও সব শেষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের পরিবেশিত হাস্যরসাত্মক নাটক দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ■

হাঁটি-হাঁটি, পা-পা। হাওড়ার এক অখ্যাত গ্রামে আল-আমীনের টলোমলো পায়ে হাঁটার সেই শুরু। আজ সে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে পূর্ব ভারতের রাজ্যে রাজ্যে। আল-আমীন মিশনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আছে অগণিত ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন আর শ্রমের কাহিনি। তেমনই এক ছাত্রের ধারাবাহিক স্মৃতিকথা, যে-কথায় আছে আল-আমীনের আর সেই শিশু-ছাত্রটির একই সঙ্গে বেড়ে-ওঠার ব্যক্তিগত বিবরণ।

আমার মিশন মিশনের আমি

রোহণ কুদ্দুস

প ঞ্চ ম কি স্তি

ছড়া লেখার বিপদ

লেখালেখি করে লোকে বিপদে পড়ে, এমনটা নতুন কিছু নয়। কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সালমান রুশদি, তসলিমা নাসরিন, শামসুর রহমান— এরকম বহু সাহিত্যিকের নাম করা যায়, যাঁরা নিজেদের লেখালেখির মাধ্যমে রাজরোষ, জনরোষ বা ধর্মীয় গুরুদের ফতোয়ার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ই যে আমারও একই হাল হতে পারে, এমনটা দূরতম কল্পনাতেও আসেনি।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। সেই সময়ের যারা ক্লাস টেন, তাদের মধ্যে পাপ্পুদার সঙ্গে আমাদের রুমের সাহিদদার বেশ ভাব ছিল। পাপ্পুদাকে দেখলেই সাহিদদা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলত, "পাপ্পু চশমাধারী/সবু তার দাড়ি" ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় লেগেছিল আমার। সত্যি বলতে কী, সাহিদদা

মিশনের ছাত্রদের প্রভাতফেরি।

ক্লাস সিক্সের ফার্স্ট বয়। সব স্যারের মুখে তার প্রশংসা। অতএব সে যা করত, আমাকেও তা-ই করতে হবে— মোটকথা সাহিদদা ছিল আমার রোল মডেল। তা পাপ্পুদার সাথে কীভাবে আমিও যেন ভাব জমিয়ে ফেললাম। বয়সের ব্যবধান থাকলেও মিল একটা ছিলই। পাপ্পুদাও 'আনন্দমেলা' পড়ত এবং খুঁজে পেতে তার কাছে সে-বছরের পূজাবার্ষিকীও পাওয়া যেত। সেই সময়ে, মানে ১৯৯৩-এ মিশনের ছাত্রসংখ্যা ছিল মেরেকেটে আড়াইশো। তাই আমরা সবাই মোটামুটি সব ছাত্রকেই চিনতাম এবং ক্লাস ফাইভের একটা ছাত্র ক্লাস টেনের এক বড়ো দাদার সঙ্গে সেই বছরের পূজাবার্ষিকী 'আনন্দমেলা'র গল্প নিয়ে গম্ভীর আড্ডা দিচ্ছে, বা খেলার মাঠে বসে দূরে জাবর কাটতে থাকা গোরুটার নাম 'পায়চারি' হতে পারে না কি, সে-বিষয়ে একটা গুরুতর (না কি গোরুতর?) তর্কে মেতে উঠেছে— এমনটা খুব অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তা এইসব দেখেটেখে ক্লাস টেনের অন্য ছাত্ররা আমায় পাপ্পুদার চ্যালা, ক্যান্ডিডেট, ল্যাংবোট ইত্যাদি বলে ডাকতে শুরু করল। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা অল্প কয়েক জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে নাম ডাকার স্বাভাবিক সূত্র অনুসারেই এটা গুনোত্তর প্রগতিতে বাড়তে শুরু করল। আমি কোনোকালেই গোপাল-টাইপ সুবোধ বালক ছিলাম না। তাই ক্লাস টেনের অধিকাংশ ছাত্র যে-ঘরটাতে থাকত, সেটা তখন ছিল ১০ নম্বর রুম, তার দরজায় ওদের বেশ কয়েক জনের নামে ছড়া লিখে একটা কাগজ দিয়ে সেঁটে এলাম।

সেন্ট টমাস কে জি স্কুলে পড়ার সময়েই ছড়া লিখে হাত পাকাতে শুরু করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, যখন থেকে আমি পড়তে শুরু করেছি, তখন থেকেই আমার লেখালেখির শুরুয়াত। প্রথম যে-বইটা হাতে এসেছিল, সেটা হল শিশু ভারতীর (নামটা ঠিক লিখলাম তো?) 'ছোটোদের রামায়ণ'। ওই বই থেকেই আমি প্রথম বাংলা রিডিং পড়তে শিখি। তারপর একে একে হাতে এসেছিল শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বহু বই। বাপি, ফুলকাকু আর রাঙাকাকু ছিল আমার বইয়ের জোগানদার। ফুলকাকু ব্লার্ব লিখেছিল এরকম একটা বই আমাদের বইয়ের আলমারিতে একদিন ঠাঁই পেল। কবি অজিত

প্রবাদপ্রতিম চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন। খলতপুরের এক অনুষ্ঠানে।

বাইরির লেখা বইটির নাম ছিল সম্ভবত 'দক্ষিণের মাটি, রাঢ়ের লোনা হাওয়া' বা 'রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের লোনা হাওয়া'। সেই বইয়ের দু-তিনটে কবিতা পড়ে বিশেষ কিছুই মাথায় ঢুকল না, কিন্তু সেই না বোঝার রহস্য ছিল অমোঘ। আমি বইটা প্রায়ই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম এবং সেই সময়ই কোনো এক ছুটির দুপুরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও কবিতা লিখব, আমারও একদিন বই বের হবে। ওই সময়ই (১৯৯০) কলকাতা বইমেলা থেকে আমার হাতে এসে পড়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর অটোগ্রাফ দেওয়া একটি 'আবোল তাবোল'। ট্যাঁশ গোরুর মুখ আঁকা রুপোলি রংয়ের অপরূপ প্রচ্ছদটাও উনিই করেছিলেন। যাই হোক, ওই একটা বই-ই আমার লেখালেখির শুরুটা করিয়ে দিয়েছিল। ছোটোরা যেমন লেখে আর কী। উপসাগরীয় যুদ্ধ, বিশ্বকাপ ফুটবল, রাম মন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্ক— যেগুলো নিয়ে সে-সময় বড়োরা আলোচনা করতেন, তর্ক করতেন, সেগুলোই হয়ে উঠেছিল আমার ছড়ার অবধারিত বিষয়। ক্লাস ফোরে পড়ার সময় আমার ক্লাসমেট অনিরুদ্ধর কাছে দেখতে পাই একটা অদ্ভুত সুন্দর ছড়ার বই— 'কুট্টি জুট্টি', কুট্টির ব্যঙ্গচিত্র আর অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া। বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা সেইসব ছড়ার মধ্যে একটা এখনও মনে আছে।

নাচ টুনটুন, গান টুনটুন
বাবা মিঠুন চক্কো
তাক ধিনাধিন নাচেন তিনি
শরীর করে বক্র

স্মৃতি থেকে লেখা, তাই কয়েকটা শব্দ এদিক-ওদিক হল হয়তো। যাই হোক, ওই বই থেকেই চারপাশের লোকজনকে নিয়ে ছড়া লেখার প্রবণতা ঢুকে যায় আমার মধ্যে। আর তাই ক্লাস টেনের দাদাদের কটূক্তির জবাব এসেছিল ছড়ায়। এবং তারপরই বুঝেছিলাম বাঁকা কলমের ধার কী মারাত্মক— ছবি হোক বা ছড়া, ঠিক জায়গায় হুল ফোটানোর ব্যাপারে এগুলোর জুড়ি নেই।

ছড়া লেখার দু-তিন দিন পরেই একদিন দুপুরের খাওয়ার পর নামাজ পড়তে যাবার তোড়জোড় করছি, কে যেন এসে জানাল আমার টিচার্স রুমে ডাক পড়েছে। টিচার্স রুমে ডাক পড়ার ব্যাপারটা যে গুরুতর কিছু হতে পারে, সেটা বোঝার মতো অপরাধ মিশনে এসে কিছুই করিনি তখনও। কিন্তু টিচার্স রুমে ঢুকেই বিপদের গন্ধ পেলাম। আমাদের রুম-টিচার ওয়ারেশ স্যার বসে আছেন একদিকে। তাঁর মুখ থমথমে। চেয়ারে বসে আছেন একজন অচেনা শিক্ষক, পরে জেনেছিলাম তিনি শতদল স্যার, ঠোঁটের ওপর একটা মুচকি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন। স্যার আমায় বললেন, "আয় বাপি, বোস।" হাতের ইশারায় ওয়ারেশ স্যারের উলটোদিকের বেঞ্চটা দেখালেন। আমি একটু শঙ্কিত হয়েই বসলাম।

শতদল স্যার একটা সাদা কাগজ টেনে নিলেন, তারপর পেন বাগিয়ে বললেন, "তুই নাকি ছড়া লিখিস? একটা শোনা।" খুব সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা যে ক্লাস টেনের দাদাদের নিয়ে ছড়া লেখার ফলাফল হতে পারে, সেটা তখনও আন্দাজ করতে পারিনি। তাই 'ছড়া' শুনে সামান্য হেসে বললাম, "কী নিয়ে ছড়া শোনাব?" শতদল স্যার মুচকি হাসিটা তখনও ঠোঁটের কোণে ধরে রেখেছেন, "লতিফকে নিয়ে যেটা লিখেছিস, সেটা শোনা।"

আমার মনে তখন কু-ডাকা শুরু হল। আমি একবার ওয়ারেশ স্যারের দিকে তাকালাম। তিনি একইভাবে বসে আছেন। মুখটা বেশ রাগী-রাগী। শতদল স্যারের দিকে ঘুরলাম এবার। তিনি কলম বাগিয়ে ডিকটেশান নেওয়ার ভঙ্গিতে বসে। আমি দুরুদুরু বুকে শুরু করলাম, "আমাদের লতিফ ... " — স্যার সেটা খসখস লিখে ফেললেন, "হুম! আমাদের লতিফ। তারপর?" এবার দ্বিতীয় লাইন: "গুন্ডাদের চিফ।" স্যার সেটাও লিখলেন। —"বলে যা।" আমি শেষ করলাম, "ভেলায় চড়ে যাবে সে সুদূর লাক্ষাদ্বীপ।" স্যার লেখা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন এবার। এতক্ষণে তাঁর মুখটা একটু গম্ভীর— "দেখ বাপি। শেষ জিনিসটা ভালো, লতিফ ভেলায় চড়ে লাক্ষাদ্বীপ যাবে। বড়ো বড়ো অভিযাত্রীরা এটা করে থাকেন। বেশ সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু যেটা খারাপ ব্যাপার, সেটা হল ..."— দ্বিতীয় লাইনটার নীচে দু-তিন বার দাগ বুলিয়ে আমার দিকে তাকালেন আবার, "কাউকে গুন্ডাদের চিফ বলা ভালো নয়। তুই লতিফকে গুন্ডা-সর্দার বলেছিস কেন?" আমি মিনমিন করে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করি, "লতিফদার গালে একটা কাটা দাগ আছে, তাই ...।" স্যার এবার পালটা যুক্তি দিলেন, "কারোর গালে কাটা দাগ আছে বলে তাকে গুন্ডাদের চিফ বলবি? ধর, তোর যদি একটা লেজ থাকত, আর লতিফ তোকে বাঁদর বলে ডাকত, তাহলে তোর কেমন লাগত?" কারোর হঠাৎ করে লেজ কেন থাকবে, সেটা মাথায় ঢুকল না আমার। আর তা ছাড়া কারোর যদি লেজের মতো লোভনীয় একটা জিনিস থাকে, তাহলে শুধু লতিফদা কেন? সারা মিশনসুদ্ধ ছেলে তার মাথা খারাপ করে দেবে। স্যারও বোধ হয় বুঝলেন উপমাটা খুব যুক্তিযুক্ত হল না। তাই একটু থেমে বললেন, "লেজ-টেজ ছাড়। গুন্ডাদের চিফ বলার জন্যে লতিফ যদি তোকে গুন্ডাদের মতো পেটায়, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছিস?"

সত্যি বলতে কী, এই সম্ভাবনার কথাটা ভেবে দেখিনি সেভাবে।

কোনো এক ছুটির দুপুরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও কবিতা লিখব, আমারও একদিন বই বের হবে। ওই সময়ই (১৯৯০) কলকাতা বইমেলা থেকে আমার হাতে এসে পড়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর অটোগ্রাফ দেওয়া একটি 'আবোল তাবোল'। ট্যাঁশ গোরুর মুখ আঁকা রুপোলি রংয়ের অপরূপ প্রচ্ছদটাও উনিই করেছিলেন। যাই হোক, ওই একটা বই-ই আমার লেখালেখির শুরুটা করিয়ে দিয়েছিল।

কারোর নামে ছড়া লিখলে, সে পালটা ছড়া লিখবে। হঠাৎ মারতে আসবে কেন? কিন্তু পরে বুঝেছি এবং এখনও বুঝে চলেছি, দিন-কে-দিন দারুণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি আমরা। পরমতসহিষ্ণুতা বলে যে একটা শব্দ অভিধানে আছে, সেটা আর কেউ মনে রেখেছে বলে মনে হয় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে সোস্যাল মিডিয়া— সর্বত্র গায়ের জোরের প্রাধান্য এতটাই প্রকট হয়ে উঠছে যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমঝোতা আসতে পারে— এই ব্যাপারটাই আমরা ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এ তো এখনকার কথা। আমি বলছি বাইশ বছর আগের কথা। তখন তো মারামারি ব্যাপারটা কথায় কথায় চলত না। তবুও শতদল স্যার তারপরও মিনিট পাঁচেক ধরে আমায় বোঝাতে লাগলেন, এভাবে লোকজনের নামে ছড়া লেখার ফলে কোন কোন বিপদে আমি পড়তে পারি।

আর কারো নামে ছড়া লিখব না— এমন প্রতিশ্রুতিতে বিনা শাস্তিতেই টিচার্স রুম থেকে ছাড়া পেলাম। রুমে এসে ঢোকার পরেই হাজির হলেন ওয়ারেশ স্যার। প্রচণ্ড বকুনি দিতে শুরু করলেন ক্লাস টেনের দাদাদের নামে ছড়া লেখার জন্যে।

তারপর থেকে কারোর ওপর রাগ হলে আমি ঠিকই ছড়া লিখতাম তার নামে। কিন্তু সেগুলো আর-সবার নজর বাঁচিয়ে লুকিয়ে রাখতাম আমার ডায়েরিতেই। পরে সেগুলো পড়ে একা-একাই হাসতাম। না, দু-দশক পরে আর মনে নেই কার নামে কী লিখেছিলাম। তবে নিজের নামে লেখা একটা ছড়া এই বেলা শুনিয়ে নিই।

বাবু রোহণ কুদ্‌দুস
নয়তো নাদুসনুদুস
রাস্তায় চলতে নিত্য
নাচে ধ্রুপদি নৃত্য
পেটো পেলেই মন খুশ

গার্লস স্কুল বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ। খলতপুর।

যাঁরা শেখান

যাঁদের কথা না বললে আমার নিজের কথা এবং মিশন সম্পর্কে যেকোনো গল্পই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁরা হলেন আমাদের শিক্ষকরা। ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়ার পর পরই যাঁদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম, তাঁদের কথাই এখন বলে নিই। পরে আস্তে আস্তে গল্প যত এগোতে থাকবে, নতুন নতুন চরিত্রের আনাগোনা এমনিই হতে থাকবে।

গরমের ছুটি শেষ হওয়ার পরে মিশনে আসার পর প্রথম যিনি ক্লাস নিতে ঢুকেছিলেন, তিনি বেশ মজার মানুষ। পড়ান ভূগোল, কিন্তু নীরস কথাবার্তা না বলে কথায় কথায় ছোটো ছোটো ছড়া বানিয়ে পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাস করার পর আমরা তো এই ছড়া-ছড়া-পড়ার পদ্ধতি দেখে অভিভূত। দুপুরে খাওয়ার পর দেখি সেই ভূগোল-শিক্ষক হাত ধুচ্ছেন। তাঁর সামান্য দূরেই দাঁড়িয়ে আমরা কয়েক জন অপেক্ষা করছি জলের কলের লাইনে। আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ক্লাসেরই হাসানুর। তাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁ রে। ওই স্যারের নাম কী রে?" সেও যথাসম্ভব গলা নামিয়ে বলল, "প্রফুল্ল জানা।" কিন্তু সেটুকুই স্যারের কানে গেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, "নাম ধরতে মানা।" প্রফুল্ল স্যার এখনও আছেন মিশনে, যাদের ওঁর ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই জান এই ছন্দ মেলানোর ব্যাপারটা।

শুধু পড়ানো নয়। পড়া ধরার সময় মজার ব্যাপার হত মাঝে মাঝে। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলে, ভেলভেলে, বল, ধান পাব কোথায় গেলে?" প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের কোন কোন রাজ্যে ধান উৎপন্ন হয়, সেটা জানা। কিন্তু যাকে প্রশ্নটা করা হয়েছে, সে সরল মনে উত্তর দিল, "ধান পাব মাঠে।" ক্লাসসুদ্ধু সবার হো-হো হা-হা হাসির মাঝে স্যার নিজের মুখটাকে গম্ভীর করার চেষ্টা করতে করতে ছন্দ মেলালেন, "মগজ নিয়ে গেছে কাকে?" কিন্তু ছড়া তখনও শেষ হয়নি। স্যার গলা তুলে আর সবার উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়লেন, "বাকি যারা হাসছিস, তারা কি টের পাচ্ছিস, চুপ না করলে গাঁট্টা খাবি টাকে?"

মুখস্থ করার ব্যাপারটা একটু বেশি বলেই ভূগোল আমার কাছে বেশ ভীতিপ্রদ। ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টেন— এই ছ-বছরে ভূগোল কতটা শিখতে পেরেছি জানি না। কিন্তু এখনও কোনো ভূগোল বইয়ের মলাট দেখলেই প্রফুল্ল স্যারের ক্লাসগুলোর কথা মনে পড়ে, ঠোঁটের কোণে আপনা থেকেই একটা মৃদু হাসি চলে আসে।

তখন বাংলা পড়াতেন নব স্যার। পুরো নাম নবকুমার আদক। নিজের মতো করে বিভিন্ন গল্প বলে পড়াতেন। বাংলাকে পাঠ্যসূচির বিষয় হিসেবে এবং তারও বাইরে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ভালোবাসার শুরু ওনার ক্লাস থেকেই। কিন্তু ওনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালো লাগা এসব শুধুই ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কেউ হয়তো ক্লাস টেনের ফেয়ারওয়েলে বক্তৃতা দেবে, একটা আবেগঘন, চোখের জল টলটল করা বক্তৃতা মুখস্থ করতে হবে। কিন্তু বক্তৃতা লিখে দেবেন কে? প্রথম পছন্দ অবশ্যই নব স্যার। সাহিদদার মুখে প্রায়ই শুনতাম, "তোমরা তখনও মিশনে ভর্তি হওনি। আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি ... " — মাত্র এক বছর আগের ঘটনাটা এভাবে অরণ্যদেবের সেই গল্পবলিয়ে মিজদাদুর মতো করে শোনাত সে, "স্বাধীনতা দিবসে বিতর্কের বিষয় 'আমরা কি সত্যিই স্বাধীন?', আমি নব স্যারকে বলতে উনি এমন একটা বক্তৃতা লিখে দিলেন যে কী বলব।" পরের লাইনটা আমরা সবাই জানি। তবু সাহিদদা চোখ বন্ধ করে তারিয়ে তারিয়ে বলত, "আমি একেবারে ফার্স্ট হয়ে গেলাম।" বিতর্ক বিষয়টা যে কী, সেটা তখনও বুঝতাম না। আমরা কেন সত্যিই স্বাধীন নই, সেটাও বুঝতাম না। ব্রিটিশরা তো দিব্যি আমাদের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে সেই সাতচল্লিশ সালে। যাই হোক, এগুলো না বুঝলেও আমার বেশ ভাবতে ভালো লাগত— একটা বিতর্ক সভা হচ্ছে আর আমি নব স্যারের লিখে দেওয়া বক্তৃতা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছি। শেষে দেখা গেল, আমিই ফার্স্ট প্রাইজ নিচ্ছি সেক্রেটারি স্যারের হাত থেকে।

ক্লাস ফাইভে অঙ্ক করাতেন হারাধন স্যার। ছোটো, গোলগাল, হাসিখুশি মানুষ। ওনাকে রাগতে দেখিনি তা নয়। তবে আমরা সবাই জানতাম সেটা সাময়িক একটা ব্যাপার। ক্লাসের অঙ্কের বইটার কিছু কিছু অঙ্ক ছিল বেশ বিখ্যাত। সেই গোরু-মহিষের অঙ্ক বা সুশীলবাবুর বাজারে যাওয়ার ব্যাপারস্যাপার এত সহজে বাস্তবসম্মত গল্প বলে বোঝাতেন

আমরা যেখানে স্নান করতাম।

আমাদের। এখন যখন কারোর মুখে শুনি অঙ্কে তার ভয় লাগে, তখন মনে হয় ক্লাস ফাইভে এ যদি হারাধন স্যারের কাছে অঙ্ক করত, তাহলে হয়তো অঙ্কটাকে ভালোবাসলেও বাসতে পারত। কারণ, ক্লাসের বইয়ের বাইরেও মজার মজার অঙ্ক শেখাতেন আমাদের। শুধু শেখানোই নয়, বার বার ব্ল্যাকবোর্ডে নানা আঁকিবুঁকি কেটে অঙ্কের পেছনে লুকিয়ে থাকা যুক্তিটা বোঝাতে চাইতেন আমাদের।

একটা উদাহরণ দিই। দশটা বিড়াল দশ মিনিটে দশটা ইঁদুর খেতে পারে। তাহলে কুড়িটা বিড়াল কুড়ি মিনিটে কতগুলো ইঁদুর খেতে পারবে? তোমরা যারা স্যারের ক্লাস করেছ, তারা জান কী করে অঙ্কটার সমাধান করা যাবে। যারা করনি এবং এখনও ক্লাস এইটে ওঠনি। তারা চেষ্টা করে দেখো। আমরা এই অঙ্কটা মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু স্যার বার বার বোঝাতে চাইতেন, কেন সহজ ঐকিক নিয়মে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এখন কখনও কখনও আমি কাচ্চা-বাচ্চাদের অঙ্ক শেখানোর সুযোগ পাই। এই অঙ্কটা আবশ্যিকভাবে তাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করি। অঙ্কে যুক্তির প্রয়োগ শেখাতে এই অঙ্কটার জুড়ি নেই।

কিন্তু হারাধন স্যারের নামডাক শুধুমাত্র অঙ্ক শেখানোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রিকেট মাঠে লম্বা লম্বা কিছু ছয় মারার জন্যেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। সাহিদদা আবার মিজদাদুর মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে গল্প শোনাত, "তোমরা তখনও মিশনে ভর্তি হওনি ..."। মোটকথা, আমরা যে-বছর ভর্তি হলাম, তার আগের বছর শিক্ষক দিবসে ছাত্র আর শিক্ষকদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল। সেই খেলায় হারাধন স্যার বেশ ক-টা ছয় মেরেছিলেন। তার মধ্যে দুটো ছক্কা গিয়ে পড়েছিল বুজার পুকুরে। বুজা কে, তার পুকুর কেন উল্লেখযোগ্য— সে-কথায় পরে আসছি। কিন্তু যে-মাঠে খেলা হচ্ছিল, সেখান থেকে প্রায় একশো গজের এমন এক ছক্কা, স্বভাবতই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। বয়সটাই ছিল তখন বিস্মিত হবার।

কিবরিয়া স্যারের কথা তো আগেই বলেছি। উনি ইংরেজি শেখাতেন। ক্লাস ফাইভের ইংরেজি শুরু হয় এ বি সি ডি থেকে, এদিকে আমার প্রাইমারি স্কুলিংটা ইংরেজি মাধ্যমে হওয়ায় আবার বর্ণমালা থেকে শুরু করা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ছিল। তাই স্যার আমায় আর দেওয়ান লুতফরকে (যাকে উনি এবং পরে আর সবাই ডি এল বলেই ডাকত) আসরের নামাজের পর নিয়ে গিয়ে বসাতেন ক্লাস এইটের দাদাদের সঙ্গে। ক্লাস এইটের কিছু বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে উনি একটা ইংলিশ ক্লাস নিতেন রোজ, সেটাতে ঠাঁই হল আমার— যাতে এতদিন শিখে আসা ইংরেজিতে মরচে না পড়ে। ব্যাপারটা এ বি সি ডি-র থেকেও বেশি ভয়াবহ ছিল। দিনের পর দিন বিকেলের খেলা কামাই করে এমন করে ইংরেজি পড়তে কাঁহাতক ভালো লাগে। ডি এল কী সব অজুহাত দিয়ে প্রায়ই আসত না। কিন্তু আমি নেহাতই বাধ্যছেলে ছিলাম, তাই পাস্ট-পার্টিসিপল শিখতে শিখতে বিষণ্ণ মনে ভাবতাম, ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই খেলার সময় শেষ হয়ে গেল।

ইতিহাস পড়াতেন সাদেক স্যার। খুব সত্যি বলতে কী, পরবর্তীকালে যতজন শিক্ষক আমাদের ইতিহাস পড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইনি ছিলেন ব্যতিক্রম। কীরকম? পরের বছরগুলোতে আমাদের ইতিহাস পড়াতেন যথাক্রমে হুমায়ুন স্যার, শাজাহান স্যার এবং জিন্না স্যার— অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক চরিত্র, অন্তত নামে। এটা পড়ে তর্কের খাতিরে কেউ বলতেই পারেন আকবরের অশ্বারোহী সেনাদলের প্রধান যিনি ছিলেন, তাঁর শ্বশুরের মামার গৃহশিক্ষকের নাম ছিল সাদেক আলি। অতএব সাদেক নামটিও ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ভারতের ইতিহাস ছেড়ে দিলেও, আমার জীবনের ইতিহাসে ব্যক্তিগত কারণে সাদেক স্যার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি মুখস্থ করে মিশনের মঞ্চে প্রথম যে-বক্তৃতাটি দিয়েছিলাম, সেটা নব স্যার নয়, এই সাদেক স্যারেরই লিখে দেওয়া ছিল।

বিজ্ঞান পড়াতেন ওয়ারেশ স্যার। পড়াতেন মানে, সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড করতেন। উঁচু ক্লাসের বই থেকে নোট করে এনে রীতিমতো সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, উদাহরণসমেত দস্তুরমতো প্রথামাফিক বিজ্ঞান পড়াতেন। কখনও কখনও ক্লাসে এসে হাজির হত ব্যাটারি, পেরেক, ইলেকট্রিক তার— চলবিদ্যুৎ কীভাবে লোহাতে চৌম্বক ধর্মের উৎপত্তি ঘটায়, তা আমরা প্রত্যেকে না বুঝলে ছাড় ছিল না। ভর আর ভারের পার্থক্য কী বা শীতকালে চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনিতে কেন কাগজের টুকরো আটকে যায়— এসব আমরা সেই বয়সেই গড়গড় করে বলতে পারতাম। ওয়ারেশ স্যারের প্রভাবে ক্লাস ফাইভে পড়তে পড়তেই আমি উঁচু ক্লাসের বইয়ের দিকে হাত বাড়াই। আবিষ্কার করি, আমাদের পাঠ্যবিষয়, সে ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞান— যা-ই হোক-না-কেন, সবই প্রায় উঁচু ক্লাসের বইতেও আছে। তাই উঁচু ক্লাসের দাদাদের থেকে ক্লাস এইটের বই চেয়ে এনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো লিখে নেওয়া বা ক্লাস নাইনের বই থেকে সবুজ বিপ্লবের নোটস নেওয়া ছিল আমার নিত্যদিনের ব্যাপার। একটা ক্লাস ফাইভের অকালপক্ক ছেলে উঁচু ক্লাসের বই ঘাঁটছে বলে আর-সবাই যত টিটকিরি দিত, আমার জেদ ততই বেড়ে যেত। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে ভাবতে শেখান অনেক শিক্ষকই। কিন্তু এক পাঠ্যপুস্তক ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ভালো পাঠ্যপুস্তক থেকে আসল জিনিসটুকু পড়ে নেওয়ার টেকনিক ওয়ারেশ স্যারের থেকেই শেখা। তাই আমাদের বড়ো হয়ে ওঠায় ওনার আর-সমস্ত অবদান যদি ভুলেও

তখন আমরা।

যাই, তাহলেও শুধুমাত্র এইটুকুর জন্যেই ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকা যায়।

সত্যি বলতে কী, আমাদের শিক্ষকদের কথা লিখতে বসলে সেটাই একটা আলাদা বই হয়ে যাবে বেশ মোটাসোটা। তাই আমাদের প্রথম বছরের প্রথম ছ-জন শিক্ষকের কথাই লিখলাম এখন, আমাদের শিক্ষকরা কেমন, সেটার একটা সাধারণ ধারণা দিতে।

মিশনের সামান্য আর্থিক বেতনের বিনিময়ে বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে এঁরা শত শত ছাত্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিনিময়ে আমাদের কাছে কিচ্ছুটি চাননি। ওঁদের দেব এমন কিছু আমাদের নেইও যদিও। কারণ, শেখান ওঁরা, দেন ওঁরা— এটাই নিয়ম। তাই জাগতিক কিছু না দিতে পারলেও, দু-হাত ভরে আমাদের ওঁরা কী দিয়েছেন, সেটা মনে করেই যেন আমাদের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে পারি— এটুকুই প্রার্থনা।

শেষ করার আগে আর-এক জনের কথা না বললে এই পর্বটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁকে আমরা 'মিশনের মা' বলতাম। আগেই বলেছি, মায়ের মতো করেই শাসন করতেন, বুকে টেনে নিতেন, আস্থা রাখতেন আমাদের ওপর। সিঁড়ির মুখে ওনার জুতোর সেই বিশেষ ঘিসঘিস আওয়াজটা পেলেই আমরা তড়িঘড়ি বই নিয়ে বসতাম। অন্যদের সতর্কও করে দিতাম, "হাসেম স্যার আসছেন।" হাসেম স্যার— আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি আমাদের সেভাবে কোনো ক্লাস নেননি কখনও, কিন্তু আমার জীবনের অন্যতম একটি শিক্ষা পেয়েছি ওনার সূত্র ধরেই। গল্পটা আগেও শুনিয়েছি 'আল-আমীন বার্তা'রই একটা সাক্ষাৎকারে। নতুন পাঠকদের জন্য তবু একবার বলি।

মাস খানেক হয়েছে বাড়ি ছেড়ে মিশনে ভর্তি হয়েছি। বাপি প্রত্যেক সপ্তায় আমায় দেখতে আসতে পারত না। যে-সপ্তায় বাপি আসত না, সেই রবিবারগুলো খুব কষ্টের ছিল। এমনই এক রবিবারে সকালের টিফিন সেরে আমি খেলার মাঠের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখ বড়ো রাস্তার দিকে। জানি বাপির সে-দিন আসার কথা নয়। কিন্তু আর কারোর বাবা-মা আসছেন। এক-একটা বাস এসে থামার পরেই হাসিমুখে কিছু মানুষজন নেমে আসছেন বাস থেকে। তাঁদের দিকে সানন্দে দৌড়ে যাচ্ছে আমার বয়সি কেউ কেউ। সেই দেখেই আমার শান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, চলে যাওয়ার আগে দেওয়ালে একটা দাগ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। আমি চলে যাওয়ার পরও যাতে আর-কেউ আমায়, আমার করে যাওয়া কাজটার মাধ্যমে মনে রাখে। শরীরে না হলেও, অন্তত নামে দীর্ঘজীবী হয়ে থাকার বাসনা মানুষের চিরন্তন।

এমন সময় পেছন থেকে আমার নাম ধরে কেউ ডাকলেন। ঘুরে দেখি, হাসেম স্যার হস্টেলের পাঁচিলের বাইরের বড়ো গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গুটিগুটি ওঁর কাছে গেলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম, শেষ এক সপ্তায় এমন কিছু করেছি কি না, যার জন্য স্যার তলব করছেন।

আমি কাছে পৌঁছোতেই মাঠের দিকে আঙুল দেখালেন, "কুকুরটা

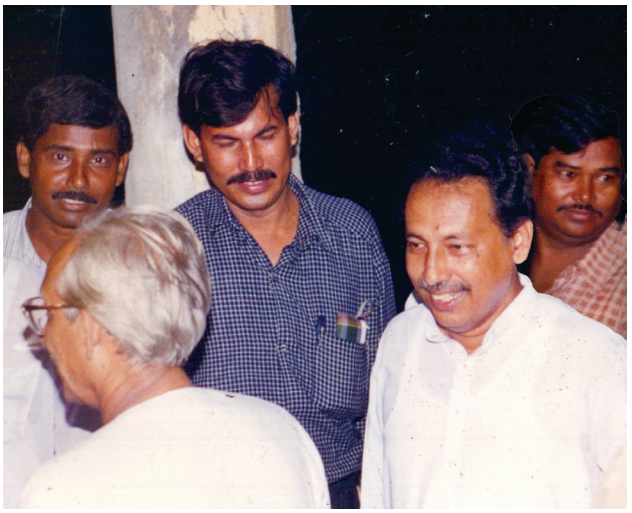

সামনে দাদু ও সেক্রেটারি স্যার। পেছনের সারিতে বাঁ-দিক থেকে প্রফুল্ল স্যার, শতদল স্যার ও হারাধন স্যার।

দেখছিস?" দেখলাম, একটা কুকুর ছুটে যাচ্ছে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো, কুকুরটা দৌড়ায়, ইংরেজিতে কী হবে?" আমি উত্তর দিলাম, "The dog runs."। স্যার মিটিমিটি হাসছেন, "কেন? runs কেন?" স্যারের মুখে হাসি দেখে আমিও সপ্রতিভ— "কারণ dog হল third person singular number."।

স্যার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে একগাল হেসে বললেন, "দেখলে? বলেছিলাম না?" বুঝলাম, আমায় নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছিল। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা না থাকার কারণে এই সাধারণ ইংরেজি জানাটাও বেশ কৃতিত্বের ছিল বোধ হয়। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে স্যার বললেন, "যা, খেলতে যা।"

এই ঘটনার এক দশক পরে আমি এক রবিবারের পড়ন্ত দুপুরে এক ছোট্ট ছেলেকে ওই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সেদিন মিশন আমার সাথে আরও কিছু ছাত্রকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলের জন্যে সংবর্ধনা জানাবে। আমি মনে মনে জানতাম, মিশনের মঞ্চে উঠে এটাই শেষবারের জন্যে পুরস্কার নেওয়া। তাই মনটা ভারী হয়ে ছিল। এমন সময় বড়ো রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা উদাস সেই ছোট্ট ছেলেটাকে দেখে পুরোনো স্মৃতি ফিরে এল। হয়তো সে-দিন তারও বাড়ি থেকে কেউ আসেননি তার সাথে দেখা করতে। কী মনে হল, তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্লাস ফাইভ?" সে ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।" এবার জিজ্ঞেস করলাম, "বলো তো, কুকুরটা দৌড়ায়, ইংরেজিতে কী হবে?" সে চকিতে উত্তর দিল, "The dog runs."। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "কেন? run-এর শেষে s কেন?" সেই ছোট্ট ছেলেটা আমায় বোঝাল, "কারণ dog হল third person singular number."।

সে-দিনই উপলব্ধি করেছিলাম, এই দুনিয়ায় কেউ অপরিহার্য নয়। আমি না থাকলেও আর-কেউ গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকবে run-এর পর s কেন হয়, সেটা বোঝাতে। এই যে এখন তোমাদের মিশনের গল্প শোনাচ্ছি, সেটা আমি না করলে আর-কেউ করত। আমরা যে-কাজই করে চলেছি, সেগুলো আমরা না থাকলেও আর-কেউ করত। তাই স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, চলে যাওয়ার আগে দেওয়ালে একটা দাগ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। আমি চলে যাওয়ার পরও যাতে আর-কেউ আমায়, আমার করে যাওয়া কাজটার মাধ্যমে, মনে রাখে। শরীরে না হলেও, অন্তত নামে দীর্ঘজীবী হয়ে থাকার বাসনা মানুষের চিরন্তন। ■

(পরের সংখ্যায়)

ছবি: জাহির আব্বাস বাচ্চু

প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের আদি-কালীন প্রধান সংস্কারক। তিনি 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক, বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাসকার। আজ থেকে দু-শো বছর আগে জন্মানো সেই মনীষী-লেখকের কথা।

প্যারীচাঁদ

সেলিম মল্লিক

"In him the Country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic enquirer."– প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে কথাগুলি লিখেছিল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। কে প্যারীচাঁদ মিত্র— কী তাঁর কীর্তি— কেন তিনি আজও প্রাসঙ্গিক? সমূহ এই জিজ্ঞাস্য বহু আলোচিত এবং বিদ্যাবান বাঙালির কাছে সুবিদিত। তবু মহাজনকথা বিরচনার এক গভীর মূল্য আছে, মানুষের চিত্তে তার প্রভাব সদর্থে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

বর্তমান লিখনের অভিপ্রায় বিশ্লেষণী সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো নয়, বরং লক্ষ্য পুনরায় পরিচয়ের নিবন্ধন। সেইসূত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের দুই শত জন্মবর্ষে এটা হবে আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতিতর্পণ।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই কলকাতার নিমতলাঘাট স্ট্রিটের বাড়িতে জন্ম প্যারীচাঁদের। মা আনন্দময়ী দেবী, বাবা রামনারায়াণ মিত্র। ঠাকুর্দা গঙ্গারাম মিত্রের নিবাস ছিল হুগলীর হরিপাল থানার পানিশাওলা গ্রাম। খিদিরপুর ডকে দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৯৩ সালে গঙ্গারাম নিমতলা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, এই স্থান প্যারীচাঁদের ভদ্রাসন। তখনকার বনেদি পরিবারের প্রথা অনুযায়ী শৈশবে তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষা গুরুমশাইয়ের কাছে, একই সঙ্গে মুনশিসাহেবের হেফাজতে চলতে থাকে ফারসি ভাষায় তালিম। আরও কিছু পরে ১৮২৭ সালে, কৈশোরের শুরুতে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, এবং ওখানেই তাঁর ইংরেজি শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে। ততদিনে তিনি পেয়ে গেছেন শিক্ষক ডিরোজিয়োর মধুর সান্নিধ্য। জ্ঞানতাপস ডিরোজিয়োর স্বপ্ন যাঁদের কর্মের অভিজ্ঞানে চিহ্নিত হয়ে আছে, প্যারীচাঁদ তাঁদের অগ্রগণ্য। 'ইয়ং ক্যালকাটা' বা 'ইয়ং বেঙ্গালে'র নীতির মধ্যে শুধু নয়, প্যারীচাঁদের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক— তা ভাবের দিক থেকে সনাতন, চিন্তায় আধুনিক। তখনকার ইংরেজিয়ানার খপ্পরে পড়া নব্যশিক্ষিত বাবুদের মতো ছিন্নমূল উৎকেন্দ্রিকতার স্রোতে বয়ে চলার বদলে ভাবনার শেকড় তাঁর নিহিত ছিল অতীত ঐতিহ্যে। ইংরেজিয়ানার চলতি হাওয়ায় যখন তাঁর বহু সতীর্থ কেবল কালের দাম দিতে ব্যস্ত, তখন তিনি দেশের মূল্য অনুধাবন করলেন। দেশ আর কালের দাবি বাঁধলেন এক সুতোয়।

প্যারীচাঁদ বুঝেছিলেন অন্তর্প্রকৃতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সাময়িক উপযোগ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংস্কৃত বা বাংলা নয় শুধু, বাঙালিকে ইংরেজি শিখতে হবে আধুনিক মন অধিকারের জন্যে। নিজে ইংরেজি শিখে

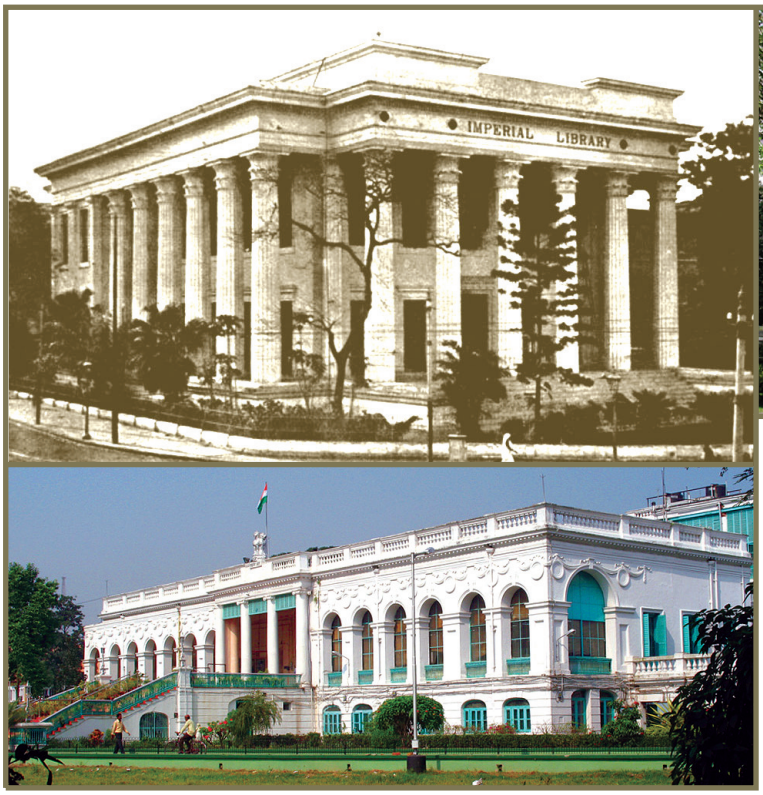

সেদিনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বাঁ-দিকে, ওপরে), যাতে মিশে গিয়েছিল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। সেই ভবনটিই আজ মেটকাফ হল (ওপরে)। পরে সেই লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হয় আলিপুরের ছোটোলাট ভবনে, যেটি এখন জাতীয় গ্রন্থাগার (বাঁ-দিকে, নীচে)।

ক্ষান্ত থাকেননি, প্রতিবেশি ছেলেদের ইংরেজি শেখানোর বাসনায় ছোটো আদালতের জজ সারদাপ্রসাদ বসু প্রমুখ গুণীজনের সহযোগিতায় নির্মাণ করেন 'হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন'। ১৮৩০ সালে নির্মিত এই অবৈতনিক স্কুলের গুরুত্ব বোঝা যায়, যখন জানতে পারি এর পরিদর্শক ছিলেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিয়ো, আর এখানে শিক্ষকতা করতেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, শিবচন্দ্র দেবের মতো সেদিনকার আলোকপ্রাপ্ত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

প্যারীচাঁদের জ্ঞানের স্পৃহা, বিদ্যা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আরও অনুকূল ভূমি পেল তাঁর কর্মজীবনের সূচনাতে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, পরে যা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, যা আজকের জাতীয় গ্রন্থাগার— প্রতিষ্ঠার বছরেই তিনি এর সাব-লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ সালের মার্চ থেকে শুরু করে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি, কিউরেটার হয়ে এখানে আসীন থেকেছেন জীবনের বাকি বছরগুলো। চাকুরির কর্তব্য বাদেও নিবিষ্ট থাকতেন বিচিত্র জ্ঞানের রাজ্যে, নতুন নতুন গবেষণার বিষয়ে। কী ছিল না চর্চার আওতায়— ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সেইসব স্বাক্ষর ঐতিহাসিকভাবে চিরদিন বাঙালির প্রধান বৌদ্ধিক প্রসঙ্গ। এ ছাড়া কৃষিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বে তাঁর অগাধ অভিনিবেশ আমাদের বিশিষ্ট আলোচনার বস্তু। এসমস্ত বিষয়ে ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা তাঁর অজস্র রচনা প্যারীচাঁদকে বুঝতে গেলে পড়তে হবে। তাহলেই ক্রমশ ক্রমশ চেনা সম্ভব হয়ে উঠবে প্যারীচাঁদের চিন্তার ধারা এবং বুঝে উঠতে সক্ষম হব তাঁর মননের পরিণতি— যার প্রস্তাবনা 'মাসিক পত্রিকা'য়, যার প্রসার 'আলালের ঘরের দুলালে'। ইংরেজিতে লেখাগুলি মূলত প্রকাশ পেত 'জ্ঞানান্বেষণ', 'ইংলিশম্যান', 'কলিকাতা রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র মতো সেই সময়ের প্রতিনিধি স্থানীয় কাগজে।

বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সঙ্গে যৌথভাবে 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা শুরু করেন ১৮৫৪ সালের আগস্ট থেকে। এই উদ্যোগ বাঙালির চেতনায় গভীর ছায়া ফেলে গেছে। এ ছিল তখনকার সংস্কৃতবহুল লিখিত ভাষার বিপরীতে গড়পড়তা মানুষের মুখের ভাষাতে লেখালেখির শুরুয়াত। এখানে সে-লেখাই গৃহীত হয়ে প্রচারিত হতে থাকল, যা স্বল্পশিক্ষিত মহিলারা অনায়াসে পড়তে পারবে, যা পড়ে ফেলতে পারবে সেইসব বালকেরা, যারা তখনও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস প্যারীচাঁদের রচনা সম্পাদনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন " ... ক্ষুদ্রকায় 'মাসিক পত্রিকা' বাংলা সাহিত্য-সংসারে যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল, আজ শতাব্দীকালের ব্যবধানে তাহা অনুমান করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।" এই পত্রিকাতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আলালের ঘরের দুলালে'র তিরিশটি অধ্যায়ের মধ্যে ২৭-তম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশ পায়। মনে রাখতে হবে, তখন বাংলা গদ্যের প্রধান দুই পুরোহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁদের লেখনীতে বাংলা ভাষা তখন এক ভাবগম্ভীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই অবস্থাতে প্রাচীন ভাষারুচির মুখে প্যারীচাঁদ, টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশেষায়িত 'আলালী ভাষা' উগরে দিলেন। পুরাতনপন্থীরা ক্ষুব্ধ হলেও, এটা যে সংস্কৃতায়িত বাংলা রচনার বিরুদ্ধে একটা রিভোল্ট, সে-কথা সদর্থেই স্মরণ করেছেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো পণ্ডিতপ্রবর। রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় অভিনন্দিত হয়েছে প্যারীচাঁদের আলালী ভাষা।

আলালী ভাষার আকর 'আলালের ঘরের দুলাল' স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। প্যারীচাঁদের অপরাপর আর-সব রচনার মধ্যে

'ইয়ং ক্যালকাটা' বা 'ইয়ং বেঙ্গালে'র নীতির মধ্যে শুধু নয়, প্যারীচাঁদের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক— তা ভাবের দিক থেকে সনাতন, চিন্তায় আধুনিক। তখনকার ইংরেজিয়ানার খপ্পরে পড়া নব্যশিক্ষিত বাবুদের মতো ছিন্নমূল উৎকেন্দ্রিকতার স্রোতে বয়ে চলার বদলে ভাবনার শেকড় তাঁর নিহিত ছিল অতীত ঐতিহ্যে।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো।

বিশেষভাবে বিশিষ্ট আলাল, তার কারণ ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ভাষাতাত্ত্বিক এবং সমাজতত্ত্বগত। ভাষার প্রাণ স্পন্দিত হয় জীবন্ত মানুষের কথনে, তার ওপর কথাসাহিত্য কথ্যভাষাকে অঙ্গীকার করলে সাহিত্যে কথার মূল্য অঙ্কন সম্ভব। সব ছেড়ে এ তো স্থির প্রত্যয়ে বলা চলে 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই মূল্যে মূল্যবান। বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতাকে তাই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারকে'র অভিধায় ভূষিত করেছেন। আলালের প্রায় তিন দশক আগের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'নববাবুবিলাস' সংস্কৃতে আকীর্ণ নয় বটে, কিন্তু সাধুতে লেখা, তা উপন্যাস নয়, সমসাময়িক উচ্চবিত্তীয় বাবুদের বৃত্তান্ত-বিবরণী। অনেকে হরিনাথ মজুমদার প্রণীত 'বিজয়বসন্ত'কে বাংলার প্রথম উপন্যাস বলেন, কিন্তু তাঁরা খেয়াল করেন না যে, তা আলালের অন্তত এক বছর পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত, আর আলাল তো ১৮৫৮-তে গ্রন্থভুক্ত হওয়ারও তিন বছর আগে থেকে 'মাসিক পত্রিকা'র ধারাবাহিকে প্রকাশ পাচ্ছিল, রচনা হয়তো আরও আগে। যদিও 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' আলালের ছ-বছর আগে ছাপা, তাও কি তাকে বাংলার প্রথম উপন্যাস বলা সংগত হবে! যখন ফুলমণি আদতে অনুবাদ, তার লেখক ভিনদেশি, কাহিনিও ভিন্ন সমাজের। শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন পরবর্তী কালের, প্রথম উপন্যাস হিসেবে আলালের পক্ষে সমর্থন সর্বাত্মক। আলাল সেই লেখা, যাতে প্রথম কেতাবি বাংলার বদলে মধ্যবিত্ত বঙ্গজনের অসংস্কৃত বোল স্রোতের মতো শতধারায় বয়ে গেছে, যেখানে প্রথম বাঙালির প্রবাদ প্রবচন গ্রন্থনে অভিষিক্ত হয়ে ভাব প্রকাশে নিজেদের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছে। লৌকিক বুলির গ্রন্থভুক্তির উন্মেষরেখা আলাল, এর পরিণত রূপ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় লক্ষ করি, মধুসূদনের প্রসিদ্ধ প্রহসনদুটির পূর্বসূরি বলে আলালকে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। তবু অস্বীকারের উপায় নেই, নকশা বা প্রহসনের সঙ্গে এর মৌলিক এবং বিস্তর প্রভেদ। আখ্যানের লঘুতা এবং কাহিনির তরল গতি একে উচ্চাঙ্গে উপনীত হতে বাধা দিয়েছে। পুরাণ, ইতিহাস, এমনকী কল্পনায় না গিয়ে আলালের লগ্নতা সামাজিক জীবনে। এই সমাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিককার বিশুদ্ধ মধ্যবিত্ত হিন্দুর সমাজ। জীবনও তাদের। স্বভাবত ভাষা খোলাখুলি। রঙ্গে ব্যঙ্গে সমাজ ও জীবন এখানে মুখরিত, সবই সজীব স্বাভাবিক বাস্তব এবং চিত্রবিচিত্র। কিন্তু শেষমেষ অবক্ষয় সামলাতে নীতিশিক্ষার দায়ে পড়ে প্যারীচাঁদ ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা রাখতে পারেননি, এই ভেবে আফশোস হয়, এটা না হলে আলাল এক বৃহৎ আর মুক্ত পরিসরে গিয়ে দাঁড়াত। তবু এ তো সত্য, শুরু করেছেন বলে তিনি চলার পথে নিঃসঙ্গ একক, অতএব তাঁর কাছে পরিণাম-প্রত্যাশা নিশ্চয় অতিরেক। কথা তুললে ভুল হবে না, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙালির উপন্যাস যে শিল্পের সার্থকতা পেল, তা কি আলালের কাছে আন্তরিক ঋণী নয়!

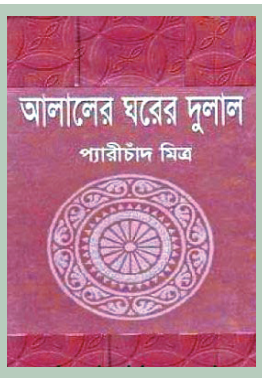

বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারকে'র অভিধায় ভূষিত করেছেন।

বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাসে আলাল মূল মনোযোগের জায়গা হলেও, প্যারীচাঁদের বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা অন্য সব রচনাও সাহিত্যকৃতি হিসেবে গুরুতর উল্লেখের যোগ্য। কৃতবিদ্য প্যারীচাঁদ আরও যা লিখেছেন, তাদের ভিতর মুখ্যত 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'রামরঞ্জিকা', 'কৃষিপাঠ', 'গীতাঙ্কুর', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'Notes of the evidence of Indian Affairs', 'A Biographical sketch of David Hare', 'The Spiritual Stray Leaves', 'Stray Thoughts of Spiritualism'। ক্রমশ ক্রমশ পরিলক্ষিত হয়, যত তিনি প্রৌঢ়তায় পৌঁছেছেন, ততই তাঁর মন দেশ-কালের দিক থেকে চলে যেতে চেয়েছে আত্মার গহন লোকে। লেখকজীবনের উত্তরভাগে তাই

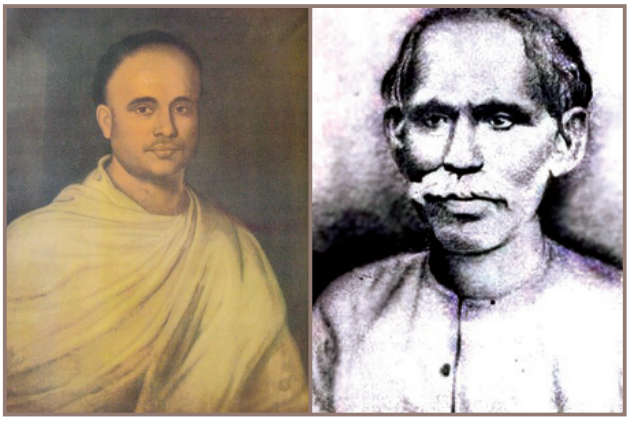
বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার দত্ত।

তিনি যত-না সহৃদয় সামাজিক, তার চাইতে বেশি একান্ত আধ্যাত্মিক। এই উপলক্ষ্যে জানাতে মন চাইছে, দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বাঙ্গালীর গান' প্রকাশ পেলে, তাতে প্যারীচাঁদের বাইশটি গানের বাণী সংকলিত হয়। ভক্তি এবং মঙ্গলময়ের প্রতি আত্ম-নিবেদন যে সেসবের মধ্যে পরমার্থ পেতে চেয়েছে, তা অনুভবে সিদ্ধ। দুটি এখানে উদ্ধৃত করলাম: "কি দিব তোমারে বল না।/(হৃদয়ের ধন!)/কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা।।/প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,/হ'লে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।/যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,/আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা।।" এবং "কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্ত্তন।/সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।।/সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,/বিকসিত পুষ্পগন্ধ, করে বিতরণ।/বন-উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,/কি আশ্চর্য্য মনলোভা, নয়ন-রঞ্জন।/ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,/যোগীর ধ্যান ভঞ্জন, শ্রবণ-মোহন।।/আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,/দেখি এত প্রেমে বৃষ্টি, স্থির কি কারণ।/উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,/সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ।।"— এসব কাব্যিক নমুনা তাঁর বৈরাগ্যের অভিলাষকে ইঙ্গিত করে। বিষয়বাসনাশূন্যতার চূড়ান্তে গেলেন ১৮৬০-এর শেষপাদ থেকে, যখন স্ত্রী বামাকালীর মৃত্যু হল। বন্ধু ও বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবের সঙ্গে প্রেততত্ত্বে ডুবে থাকতেন। স্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতে প্লানচেটে মগ্ন হয়ে পড়তেন। যাই হোক, অধুনা ডানলপের বি টি রোড সংলগ্ন তাঁদের পারিবারিক মন্দির, কুলদেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহন

রামতনু লাহিড়ী।

জিউর দেবাঙ্গানে তখন প্রায়ই দেখা যেত প্যারীচাঁদ কীর্তনে মশগুল, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আলাপরত। এসব ইন্ধনের ফলশ্রুতিতে হয়তো তাঁকে আমরা ১৮৮২-তে পাই 'বেঙ্গল থিয়োসফিকাল সোসাইটি'র সভাপতির আসনে।

কিন্তু, বাঙালি প্যারীচাঁদকে চেনে ভক্তিমার্গের পথিক কিংবা সন্তসাধক হিসেবে নয়, তাঁর নাম দেশবাসীর হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে দেশ-উদ্ধারে তাঁর পতিতপাবনী উদ্যোগের জন্য। তাই প্রথমত তিনি সমাজসংস্কারক, এবং শেষ পর্যন্ত বহুবিধ সংস্কারের ঋত্বিক হয়ে শতাব্দী পেরিয়েও বেঁচে আছেন। এ কেবল বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর মধ্যে দেখি না, তাঁদের বংশের রক্তেই এর বীজমন্ত্র ছিল, ভাই কর্মবীর কিশোরীচাঁদ সে-সময়ের মহাগৌরব, ভাইবউ কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনার পাঠে বিমুগ্ধ আমরা।

এ-হেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের বহু উল্লেখ করেও তামাম শোধ হবে না। ১৮৩৬-এর মার্চে ইয়ং বেঙ্গালের উদ্যোগে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠা হলে তিনি রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। হয়তো শুরুর দিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তবু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনেও সময় কম খরচ করেননি। ১৮৩৯ সাল নাগাদ প্রথমে কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যান্ড কোং' নামে আমদানি-রপ্তানির কোম্পানি খোলেন, পরে তারাচাঁদের মৃত্যু হলে ব্যবসায়ে নিজের দুই পুত্র অমৃতলাল-চুনীলালের অংশীদারি নেন, যা 'প্যারীচাঁদ অ্যান্ড সন্স' নাম নিয়ে চলতে থাকে। ব্যাবসা ফাঁদলেন বটে, কিন্তু তাঁর চিরাচরিত অবাধ বিচরণ সারস্বত অঙ্গানে। তাই তাঁকে দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র সম্পাদক পদে, 'বাংলা অনুবাদ সমিতি'র প্রধান সংগঠক ও অনুবাদক হিসেবে, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'বিটন সোসাইটি'র 'কমিটি অব পেপারসে'র সদস্যরূপে।

চার্লস পোটের আঁকা ছবিতে ডেভিড হেয়ার, সঙ্গে দুই প্রিয় ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও তারকনাথ ঘোষ।

'পশুক্লেশ নিবারণী সভা', 'বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা', 'স্কুলবুক সোসাইটি', 'এগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'র মতো আরও যেসব সংস্থা তাঁর ক্লান্তিহীন চেষ্টা ও উপদেশনায় সেদিন বাংলায় চৈতন্যের জোয়ার এনে দিয়েছিল, তা যে বঙ্গীয় ইতিহাসের আধুনিক অধ্যায়ের ভূমিকা, এ-কথা নিশ্চয়ভাবে সত্য। অতিজীবিত এই মানুষটির দেহান্ত হয় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা অনেক অনেক প্রগতির পাল তুলে এখন আলোকিত সমন্বয়ে এসে ঠেকেছে। তবুও অধমর্ণ আমরা প্রায় দুই শতাব্দী পেছনের এক সন্ধিসময়ের কান্ডারি উত্তমর্ণ মহাজন প্যারীচাঁদের সামনে কৃতজ্ঞতায় নত।

টীকা-টিপ্পনী

হিন্দু প্যাট্রিয়ট: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে এই পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৩ সালে মধুসূদন রায়ের মালিকানাধীনে এর প্রকাশ শুরু হয়। পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এটি কিনে নেন, এবং তাঁর সম্পাদনায় কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সময়ের কৃতবিদ্য বহু বাঙালিই ছিলেন এর নিয়মিত লেখক।

ভদ্রাসন: মূলত সাধক-কবিদের বাসভূমিকে ভদ্রাসন বলার রীতি বাঙালির লিখন ও কথন অভ্যাসের মধ্যে এখনও বিশিষ্টরূপে বর্তমান।

হিন্দু কলেজ: ১৮১৬ সালে ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবে ১৮১৭-র জানুয়ারিতে কলকাতায় গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪ চিৎপুর রোডের ভাড়াবাড়িতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। পরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে, আরও পরে টেরিটি বাজারের একটি ভাড়াবাড়িতে তা স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান বাড়ির ভিত স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে, ১৮৫৪ সালে সরকারিভাবে নামকরণ হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান হিন্দু কলেজ আজ স্বতন্ত্র এক বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিরোজিয়ো: সেদিনের কলকাতার ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড, আজকের আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডে ১৮০৯ সালের ১৮ এপ্রিল জন্ম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়োর। না কেবল ভারতীয়, নয় শুধু ইউরোপীয়— অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এই জ্ঞানতাপসের মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতনি চিন্তা ও ইউরোপের আধুনিক ধারণার সমন্বয় ঘটেছিল। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বাঙালিকে মনে রাখতে হবে। কি শিক্ষা কি সমাজসংস্কারের জন্য তাঁর কাছে আমরা ঋণী। ইয়ং বেঙ্গালরা ছিলেন তাঁর অনুগামী। আজও তাঁর কবিতার অনুরাগী নিতান্ত কম নয়। মৃত্যু ১৮৩১ সালে।

ইয়ং বেঙ্গল: ইউরোপের হাওয়া গায়ে-লাগা একদল বাঙালি তরুণ। যেহেতু সবাই কলকাতার ছেলেপুলে, তাই ইয়ং ক্যালকাটা নামেও পরিচিত। এরা ডিরোজিয়োর প্রিয়পাত্র। বাংলার সমাজসংস্কার ভেঙে এরা মুক্ত চিন্তার জোয়ার এনেছিল। এদের ইংরেজি ভাষায় ছিল গভীর অনুরাগ, পাশ্চাত্য দর্শনে অনেক দূর পর্যন্ত দখল ছিল। এরাই উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের পদাতিক।

ডেভিড হেয়ার: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ড থেকে ঘড়ির ব্যাবসা করতে এ-দেশে আসেন ডেভিড হেয়ার। জন্ম ১৭৭৫ সালে। ব্যবসায়ী হেয়ার কিন্তু ব্যাবসার বদলে বেশি করে জড়িয়ে পড়লেন বাংলার শিক্ষা ও সংস্কার প্রয়াসে। হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগ ভুলবার নয়। আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। হেয়ার স্কুল আদতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পটলডাঙা স্কুল। মৃত্যু ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক: ইয়ং বেঙ্গালদের মধ্যে অগ্রণী রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮১০ সালে কলকাতার সিন্দুরিয়াপটিতে জন্মগ্রহণ করেন বলে অনুমান। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন ইয়ং বেঙ্গালদের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'। মৃত্যু ১৮৫৮ সালে।

রাধানাথ সিকদার: একজন প্রধান ইয়ং বেঙ্গাল রাধানাথ সিকদার ১৮১৩ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর অন্তঃপাতী সিকদারপাড়ায় জন্ম নেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন 'মাসিক পত্রিকা'। মৃত্যু ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে।

শিবচন্দ্র দেব: জন্ম ১৮১১ সালে কোন্নগর গ্রামে। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা স্মরণ করবার মতো। ব্রাহ্মধর্মে ছিল অনুরাগ। মৃত্যু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে।

জ্ঞানান্বেষণ: ইয়ং বেঙ্গালদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রথম প্রচারিত হয় ১৮৩১ সালের ১৮ জুন। ১৮৪০ সালের নভেম্বর মাসের পর এই পত্রিকা আর প্রকাশ পায়নি।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর: রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। প্রকাশের সূচনা ১৮৪২ সাল, ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে আর প্রকাশ পায়নি এই পত্রিকা।

অক্ষয়কুমার দত্ত: ১৮২০ সালে বর্ধমানের চুপীতে জন্ম। বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা অপার। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা করতেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচনা বাঙালির চিরদিনের সম্পদ। মৃত্যু ১৮৮৬ সালে।

তাঁদের লেখনীতে বাংলা ভাষা: তাঁদের লেখনীতে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তর লেখা বাংলা গদ্য।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের নমুনা: "রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঞ্চালমাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং, না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশল রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।" ['সীতার বনবাসে'র অংশ।]।

অক্ষয়কুমার দত্তর গদ্যের নমুনা: "মনুষ্যেরা যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার-ধর্ম্মাদি-বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্ন-সম্ভূত উন্নপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল-শিক্ষা-নিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃত-শাখা প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদ-নাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকা-সংযুক্ত জন-শূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার-তরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়-শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতি-জনক ভূমিকম্প, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য-তারকা-মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধগগন-মণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি-সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।" ['ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' থেকে নেওয়া।]।

রামগতি ন্যায়রত্ন: জন্ম ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিবৃত্তকার। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটি তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। মৃত্যু ১৮৯৪ সালে।

আলালী ভাষা: আলালী ভাষার নমুনা হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ১৭-তম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত হল— "বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে— পথঘাট পেঁচ২ সেঁত২ করিতেছে— আকাশ নীল মেঘে ভরা— মধ্যে২ হড়্ মড়্২ শব্দ হইতেছে, বেংগুলা আশে পাশে যাঁওকোঁ২ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে— বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ— কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে২ যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া— "হাংগো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক২ বার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক২ বার গুন২ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল— ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু থা পাই না— হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর— এদিকে বাসন মাজা হয় নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে— আমি একলা মেয়েমানুষ এসব কি করে করব আর কোন দিগে যাব?— আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা? নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল— এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়— কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নাপ্‌তিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল— ও মা আমি কোজ্জাব? বুড় ঢোস্কা আবার বে কর্‌বে। আহা! এমন গিন্নী— এমন সতী লক্ষ্মী— তার গলায় একটা সতিন গেঁতে দেবে— মরণ আর কি! ও মা পুরুষ জাত সব করতে পারে! নাপিত আশা-বায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে— ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।" [কোনো শব্দের পাশে ২ থাকলে সেই শব্দটি দু-বার পড়তে হবে। এটি লেখার পুরোনো রীতি।]।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮২২ সালের ৫ মার্চ থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ভাষার আদি পর্বের প্রধান লেখক। তাঁর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কলিকাতা কমলালয়'। ছদ্মনাম প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যু ১৮৪৮ সালে।

হরিনাথ মজুমদার: 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' গানটির রচয়িতা কাঙাল হরিনাথ আদতে হরিনাথ মজুমদার। বর্তমান কুষ্ঠিয়ার কুমারখালিতে ১৮৩০ সালে জন্ম। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র, যা ঐতিহাসিক কারণে বহু আলোচিত। মৃত্যু ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা: রচনাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০—১৮৭০)। কালীপ্রসন্ন মাত্র তেরো বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সংস্কৃত মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের জন্য তিনি স্মরণীয়, তবে বিদ্যাসাগর-সহ আরও অনেক পণ্ডিতের হাত এ-অনুবাদে আছে বলে মনে করা হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' তাঁর অন্যন্য সৃষ্টি। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার সেন জানিয়েছেন, গ্রন্থটির আসলে লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য নকশার ভাষারূপ: "কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই— "আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!" " [সূচনা-অনুচ্ছেদ।]।

মধুসূদনের প্রসিদ্ধ প্রহসনদুটি: মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসনদুটি হল— 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

কিশোরীচাঁদ: প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুজাত কিশোরীচাঁদ মিত্রের জন্ম ১৮২২ সালে কলকাতা শহরে। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের কৃতী এই ছাত্র ইয়ং বেঙ্গালদের অন্যতম একজন। বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তিনি। সম্পাদনা করেছেন 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকা, যুক্ত ছিলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রের সঙ্গে। মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

রামতনু লাহিড়ী: উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ কৃতকর্মা আচার্য রামতনু লাহিড়ীর জন্ম ১৮১৩ সালে নদীয়ার বারুইদা গ্রামে। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও পরে ওই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা স্মরণযোগ্য। নারীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আরনোল্ড অফ বেঙ্গাল রামতনু মহাশয়ের মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী: জন্ম ১৮০৪ সালে। সংস্কৃত থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং ইংরেজি-বাংলা অভিধান রচনায় তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থায়ী সভাপতি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কুইল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যু ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ■

গত উনতিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

মহম্মদ মিনারুল ইসলাম

হার না মানা এক জীবন

আসাদুল ইসলাম

কোনো একজন মানুষের জীবনে মায়ের ভূমিকা কতটা? নয় মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করলেই কি মা শব্দের হৃদয়স্পর্শী যে-ব্যাপ্তি, সেখানে পৌঁছোনো যায়? অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভধারণ-পরবর্তী সময়ের ভূমিকাই একজন নারীকে মা করে তোলে। হয়তো এই কারণেই গর্ভে ধারণ না করেও কেউ কেউ মায়ের মতো হয়ে ওঠেন। আজ থেকে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগের এক মায়ের কথা বলি আপনাদের। বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামের নাম বুধিগ্রাম। পঁচিশ বছর আগে ওই বুধিগ্রাম সন্ধ্যা নামার সঙ্গে পৌঁছে যেত ঘুমের দেশে। গ্রামের সকল রমণী যখন সন্ধ্যা নামার খানিক পরেই হ্যারিকেন বা লণ্ঠনের বাতি কমিয়ে শুয়ে পড়তেন, তখন জেগে থাকতেন একজন। সামান্য জমির ফসল থেকে জীবিকার সংস্থান হত না বলে তাঁদের ধান-চালের ব্যাবসা করতে হত। ধান-চালের ব্যাবসা মানে ধান কিনে তা সেদ্ধ-শুকনো করে চাল তৈরি করা, তৈরি চাল বাজারে বিক্রি করা। এ-কাজে ঘরের মেয়েদের ভূমিকা অনেকখানি। ধান একবার ভাপানো, তারপর জলে ভিজিয়ে রেখে এক-দু দিন পরে সেদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ ধানকে রোদে মেলে রেখে, বারা বার নেড়েচেড়ে শুকিয়ে ঝনঝনে করে তুললে তবেই সেই ধান মেশিনে ভেঙে চাল পাওয়া যাবে। পুরো এই প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। পরিশ্রমসাধ্য হওয়ার কারণেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে চাল তৈরির এই ব্যবস্থা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিবর্তে মিলের তৈরি অপেক্ষাকৃত কম পুষ্টিকর চালকেই মানুষ কিনছে ওই পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচতে। তো বুধিগ্রামের ওই মা সারাদিন ধান সেদ্ধ-শুকনোর কাজ করে সংসারে নিজের ভূমিকা পালন করতেন। সন্ধ্যার পর ক্লান্তিতে চোখ বুজে এলেও মাটির দাওয়ায় আলো জ্বেলে বসে থাকতেন— ছেলে কখন টিউশনি পড়ে বাড়ি ফিরবে সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে। সন্তান শর্ত দিয়ে পড়তে যেতে রাজি হয়েছে— যদি তুমি জেগে থাকো তবে আমি পড়তে যাব, পড়ে এসে যদি দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ তাহলে আমি যাব না। তাই জেগে থাকা, সমস্ত ক্লান্তিকে পাশে সরিয়ে রেখে মায়ের ভূমিকা পালন করা। এমন নারীরাই তো মা শব্দকে

মহম্মদ মিনারুল ইসলাম।

কর্মস্থলে মহম্মদ মিনারুল ইসলাম।

মহিমান্বিত করে তুলেছেন। সফল সন্তানদের অনেকটা জুড়ে থাকেন এঁরা। কখনও কখনও দেখা যায় জীবনে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিশেষ ভূমিকা পালন করে হয়ে উঠেছেন 'মায়ের মতো'। বুধিগ্রামের ওই মা যদি হন সেনেহার খাতুন, তাহলে 'মায়ের মতো' যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেন ওই সন্তান, তার নাম আল-আমীন মিশন। আল-আমীন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনী ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ মিনারুল ইসলামকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিপালন করে তৈরি করেছিলেন তাঁর মা। ক্লাস নাইন থেকে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া পর্যন্ত তিনি লালিত হয়েছেন আল-আমীন মিশনে। পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর মানুষদের স্বপ্নের লালনভূমি আল-আমীন মিশন হয়তো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলেই এই ব্যাখ্যা তাঁর। কিন্তু মিনারুলের মায়ের সঙ্গে সেই সময়ের আল-আমীন মিশনের আরও একটা বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল— অনটনের মাঝেও সন্তানকে মানুষ করার লড়াইয়ের অদম্য ইচ্ছা। আসুন মিনারুল, সেনেহার খাতুন আর আল-আমীন মিশনের যৌথ লড়াইয়ের গল্পে এবার প্রবেশ করি।

এখন আমরা যাব পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার বুধিগ্রামে। হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে রামপুরহাট, রামপুরহাট থেকে বাসে বুধিগ্রাম। বুধিগ্রামকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে ব্রাহ্মণডিহি, বারমল্লিকা, কাশিপুর, ইমামনগর গাঙ্গোরডাক, ইশিরা-উস্তাপাড়া গ্রামগুলি। ব্রাহ্মণডিহি আর ইমামনগর— এই গ্রামদুটির নাম দেখেই খানিক আন্দাজ করা যায়, জনপদটিতে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বসবাস। মোটের ওপর কৃষিনির্ভর জীবন। প্রধান ফসল ধান। এ ছাড়া গম, সর্ষে, আলুসহ অন্যান্য ফসলও হয়। কৃষিনির্ভর জীবন হলেও পরিবার-পিছু গড় জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় বুধিগ্রামে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। শিক্ষার হারও ভালো। গ্রামে চাকরিবাকরি করা লোকজনও আছেন বেশ কয়েক জন। পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা পাহাড়ের মাঝে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি থাকে, তেমনি বুধিগ্রামেও অবস্থাপন্ন পরিবারের পাশে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারও আছে। এই যেমন মিনারুলদের পরিবার। অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকা উপেক্ষিত স্বজন।

মিনারুলের আব্বা মহম্মদ জাকির হোসেন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে চাষবাসকেই নিজের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সম্বল ছিল পারিবারিকসূত্রে পাওয়া বিঘে আড়াই জমি। এই সামান্য জমি দিয়ে দুই ছেলে এক মেয়ে-সহ পাঁচ জনের সংসারকে টেনে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হচ্ছে দেখেই শুরু করেছিলেন ধান-চালের ব্যাবসা। তাতেও যে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না, তা বোঝা যায় যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া মিনারুলকে চামড়ার ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ শিখতে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তখন। সে-কাজ শেখা অবশ্য সম্পূর্ণ হয় না, কয়েক দিন পরেই বাড়ি ফিরে আবার পড়াশোনায় মন দেন। মিনারুলের পড়াশোনা শুরু গ্রামের বুধিগ্রাম প্রাইমারি স্কুলে। মিনারুল যখন পড়াশোনা করতেন তখন শুধু স্কুলটার নামটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির যে-বাড়িটায় স্কুল চালু হয়েছিল, এক সময় তা ভেঙে গেলে ওই নামটুকু সম্বল করেই স্কুল চলত খোলা আকাশের নীচে কারো বাড়ির দেওয়াল বা প্রাচীরের পাশে। আর বর্ষায় কারো পরিত্যক্ত বাড়ি বা গোয়ালঘরে। প্রাইমারি শেষ করে মিনারুল ভর্তি হন বুধিগ্রাম অঞ্চল হাইস্কুলে। বাড়ির কাছেই সহশিক্ষামূলক এই স্কুলটিতে মিনারুল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। প্রাইমারির মতো হাইস্কুলেও বরাবর ফার্স্ট হতেন। ভালো ছাত্র হওয়ার কারণে মিনারুল স্কুলের স্যার আর পাড়ার কয়েক জনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, প্রয়োজনে নানাভাবে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন। স্কুলের নাসিম স্যার, প্রণব স্যার যেমন পড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন, তেমন প্রধান শিক্ষক আবদুল্লা-হিল কাফি বইপত্র দেওয়া থেকে, স্কুল শেষে সব কাজ চুকিয়ে পড়া দেখিয়ে দিতেন। আর টিউশনি পড়ার সূত্রে নেপুভাই, টুটুলভাই, বকুল স্যার, তুষার স্যারদের সাহায্যের কথা যেমন আজও ভোলেননি মিনারুল, তেমনই এলাকার এক এক্সপার্ট টিচার বিনা পয়সায় কি পড়া যায় বলে বিস্ময় প্রকাশ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, অল্প কয়েক দিন পয়সা দিয়ে পড়ার পর, সে-কথাও ভোলেননি। ক্লাস নাইনে উঠে সবে দু-তিন মাস ক্লাস হয়েছে, একদিন স্কুল

সমস্ত ক্লান্তিকে পাশে সরিয়ে রেখে মায়ের ভূমিকা পালন করা। এমন নারীরাই তো মা শব্দকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। সফল সন্তানদের অনেকটা জুড়ে থাকেন এঁরা। কখনও কখনও দেখা যায় জীবনে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিশেষ ভূমিকা পালন করে হয়ে উঠেছেন 'মায়ের মতো'। বুধিগ্রামের ওই মা যদি হন সেনেহার খাতুন, তাহলে 'মায়ের মতো' যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেন ওই সন্তান, তার নাম আল-আমীন মিশন।

থেকে ফেরার পথে গ্রামের গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, মিনারুল যাঁকে মেজোভাই নামে ডাকেন, বললেন আল-আমীন মিশনের কথা। গিয়াসুদ্দিন সাহেব কলকাতায় এমএ পড়তে আসার সূত্রে আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলামের সহপাঠী ছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর আগের আল-আমীন মিশনের আজকের মতো নামডাক, পরিচিতি ছিল না। গিয়াসুদ্দিন সাহেব মিনারুলের মা-আব্বার সঙ্গে কথা বলায়, ছেলের পড়াশোনা ভালো হবে শুনে যতটা আশান্বিত হলেন, খরচার ভাবনায় ততটাই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। সবটা শুনে ভাবলেন, ওই স্কুলে পড়ার জন্য যদি কোনো খরচা নাও লাগে, ছেলেকে পাঠানোর গাড়িভাড়াসহ যৎসামান্য আরও কিছু পয়সা তো লাগবে, সেটাই জোগাড় করবেন কীভাবে? জানি না সেদিন কীভাবে মিনারুলের মা-আব্বা প্রতিবেশীর থেকে টাকা ধার করে মিনারুলকে পাঠিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু কপাল যখন মন্দ হয় তখন কতরকমভাবেই-না বিড়ম্বনা নেমে আসে মানুষের জীবনে! এ-বিষয়ে আমরা খানিকটা আন্দাজ পেতে পারি মিনারুলের জীবন থেকে। আল-আমীন মিশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে সকালের ট্রেনটা ফেল করলেন মিনারুলরা। বিকালের ট্রেন ধরে সন্ধ্যায় হাওড়ায় পৌঁছোলেন। সেটা ছিল জুলাইয়ের শুক্রবার। সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে বাস ধরে খলতপুর অর্থাৎ আল-আমীন মিশন যাওয়ার মাঝপথে বাস আটকে গেল। রাস্তার মাঝখানে একটি লরি খারাপ হয়ে বসে গেছে, কোনো যানই চলাচল করতে পারছে না। সাতসকালে খেয়ে বের হয়েছিলেন মিনারুলরা। কাছে তেমন দোকানও নেই, চা-দোকানে যা ছিল, তাও প্রায় শেষ করে দিয়েছে যাত্রীরা। এমনিতেই বর্ষার আকাশ, দিনের বেলা বৃষ্টি ঝরছে। সন্ধ্যার পর সেই বৃষ্টি আরও বাড়ে। চায়ের দোকানে পড়ে থাকা বিস্কুট-জাতীয় খাবার খেয়ে বৃষ্টির মধ্যে সেই বাসে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে মিশনে পৌঁছেছিলেন মিনারুলরা। সেক্রেটারি স্যার মানে এম নুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হল দুপুরের পর, তাঁর তৎকালীন কর্মস্থল আসন্ডা হাইস্কুল থেকে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন। সেক্রেটারি সব শুনলেন। মিনারুলরা দুজন ছিলেন। অন্যজন রাজু, তিনি ক্লাস ইলেভেনে আর্টস পড়ার জন্য এসেছিলেন। মিশন তখন খলতপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে উচ্চমাধ্যমিক চালু হলেও কেবল বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ ছিল। মিনারুলের ভর্তির ব্যাপারেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তখন ক্লাস নাইনের মাস তিনেক ক্লাসই শুধু হয়ে যায়নি, তার চেয়েও বড়ো সমস্যা হল মাধ্যমিক বোর্ডে নাম নথিভুক্তির জন্য যে-রেজিস্ট্রেশন হয়, তার জন্য সব ছাত্রের নাম আসন্ডা স্কুলে পাঠানো হয়ে গেছে। ওই স্কুলের মাধ্যমেই পরীক্ষায় বসবে আল-আমীনের মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীরা। যদি নাম না পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, তাহলে মিনারুলের নামও নথিভুক্ত করা যাবে, নইলে এক বছর নষ্ট হবে। শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য পরের দিন সেক্রেটারি স্যার তাঁর সেই সময় যাতায়াতের জন্য কেনা এম-৮০ মোটরসাইকেলের পিছনে মিনারুলকে বসিয়ে আসন্ডা হাইস্কুলে নিয়ে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করলেন। প্রথম ফাঁড়া কাটল। কিন্তু জীবনপথে ঠোক্কর খাওয়ার কি শেষ আছে! সমস্যাসংকুল জীবনে প্রতিপদে যুঝতে হয় মানুষকে। না হলে, বুধিগ্রাম থেকে যে-দিন আল-আমীনে পাকাপাকিভাবে চলে আসছেন, সে-দিনও সমস্যায় পড়তে হয় মিনারুলদের! সে-দিন রামপুরহাট থেকে ট্রেনে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে বাসে করে হুগলির চাঁপাডাঙ্গা হয়ে আল-আমীন আসছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মিনারুলের মেজোভাই, আর বিস্কুটের একটি কার্টুন। কার্টুনে প্রিয় ছাত্রের জন্য বুধিগ্রাম অঞ্চল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লা-হিল কাফিসহ অন্যান্য স্যারদের জোগাড় করে দেওয়া নাইন-টেনের বইপত্র। সমস্যা হল চাঁপাডাঙ্গায় নেমে। একেবারে অজানা-অচেনা জায়গা। তখন রাত আটটা হয়ে গেছে। মিশন যাওয়ার জন্য ডিহিভুরসুটগামী বাস, ট্রেকার কিচ্ছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ ভবন, যা মহম্মদ মিনারুল ইসলামের কর্মক্ষেত্র।

নিরুপায় হয়ে রাস্তার হোটেলে সস্তার খাবার খেয়ে বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে গেলেন। আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা নিয়ে রাত কাটিয়ে, পরদিন মিশনে পৌঁছোলেন। শুরু হল মিনারুলের জীবনের নতুন অধ্যায়। বুধিগ্রাম থেকে আল-আমীন মিশনে আসার এতগুলো ঘটনা একটু বিস্তারিত বলতে হল। কারণ, সাফল্যের দরজায় পৌঁছোতে গেলে কতটা মরিয়া হয়ে এগোতে হয় মানুষকে, সেটা মিনারুলের আল-আমীনে আসার প্রক্রিয়াটাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। হয়তো এই জন্যই পরবর্তী জীবনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, চাকরি পাওয়া, ইত্যাদি ঘটনার পিছনে মিনারুল আল-আমীনে আসাটাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আরও একটা জিনিস তাঁর জীবনে বড়ো পাওনা— সেক্রেটারি স্যারের সান্নিধ্য। দারিদ্র্যের উত্তাপ গায়ে মেখে এতটা পথ এসেছেন মিনারুল। আল-আমীন মিশনের নিজস্ব যে-অর্থকষ্টের মধ্যে এসে পড়েছিলেন, তা অনুভবের শক্তি তিনি আগেই অর্জন করেছিলেন। স্যারের কথা তাই অনেক বেশি তাঁর হৃদয় ছুঁয়ে যেত। মিশনের কুড়ি বছর আগেকার অবস্থা, লড়াইয়ের কথা মিনারুলের থেকে কিছুটা শুনে নেওয়া যাক: "স্যার এখন ব্যাস্ত থাকেন মিশনের বিস্তার ঘটানো আর সুনাম ধরে রাখার কাজে, আর তখন ব্যাস্ত থাকতেন মিশনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সারা সপ্তাহের মধ্যে আমরা রবিবার পেতাম স্যারকে। কোনো কোনো দিন স্যার আমাদের সঙ্গে রাতে থেকে যেতেন। ওই রাতে ছেলেদের, বিশেষ করে ক্লাস টেন ইলেভেন টুয়েলভের ছাত্রদের নিয়ে ছাদে গিয়ে বসতেন। স্যারকে মাঝের চেয়ারে রেখে আমরা গোল হয়ে বসতাম। কলকাতায় সারাদিন ঘুরে কী হল, সেইসব নানা দুঃখ-কষ্ট, ভালো লাগা ঘটনার কথা বলতেন। বিভিন্ন মানুষের কথা বলে আমাদের মোটিভেট করতেন। কীভাবে পড়লে ভালো রেজাল্ট করা যাবে, রেজাল্ট ভালো হলে আমরা কেমন করে দেশে-বিদেশে চাকরি করতে যাব— সেসব কথা বলতেন। আমরা নানা সমস্যার কথা বলতাম। সব শুনে স্যার তার ব্যাখ্যা দিতেন। স্যারের কষ্টের কথা বলতেন। বলতে বলতে ভোর হয়ে যেত। শেষরাতে আমরা ছ-আট জন মিলে স্যারকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতাম। সেই সময়ের কথা মনে পড়লে আজও আমার মনে শিহরন জাগে। স্যারের লড়াইয়ের সাক্ষী সেই সময়কার আমাদের মতো ছাত্ররা। মিশনের আর্থিক সমস্যা আমরা দেখেছি। পাওনাদারদের টাকা দেওয়ার জন্য আমি, আশরাফুলদা, আলমগীরদা স্যারের স্ত্রীর গহনা নিয়ে গিয়ে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছি। স্যারকে নিজের বেতন তুলে এনে মিশনের স্যারদের বেতন দিতে দেখেছি। বড়ো হয়ে সব দেখেশুনে বুঝেছি, সমগ্র সমাজেই স্যারের মতো সমাজদরদী মানুষ খুব কমই আছেন।" আজকে আমরা যারা

আমরা ২০০০ সালে জয়েন্ট দিয়েছিলাম। তখন জয়েন্ট কোচিং হত পার্কসার্কাসে, সপ্তাহে দু-দিন। শনি-রবি। খলতপুর থেকে খেয়ে এসে সারাদিন ক্লাস করে জাননগর রোডে, আল-আমীনের সেই সময়কার কলকাতার ঠিকানায় রাত্রিযাপন করতে হত। সমস্যা হত রাতে ঘুমোনো নিয়ে। আমাদের সবার ঘুমোনোর জায়গা হত না। আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে কিছু ছাত্র ঘুমোতাম, কিছু ছাত্র জেগে থাকতাম, পড়তাম। প্রথম দল কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার পর তাদের তুলে দিয়ে দ্বিতীয় দল ঘুমোতে যেত।

আল-আমীনের প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রীসহ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটার বেশি শাখার কথা শুনছি-দেখছি তাদের মিনারুলের কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু মিনারুলের কথা একশো শতাংশেরও বেশি সত্যি। মিনারুল তাঁর জীবনের কথা বলতে গিয়ে আরও একবার মিশনের ইতিহাসে ডুব দেন: "আমি ১৯৯৭ সালে মাধ্যমিক দিই। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন ছিলাম আমরা। আমি স্টার পেয়েছিলাম। উচ্চমাধ্যমিকে পাই ৬৫.৭ শতাংশ নম্বর। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আরও কিছু নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। দুটো স্কুলের মাধ্যমে দু-ভাগ হয়ে আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমরা যে-স্কুলটা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেই স্কুলের অংশটার ভালো ফল হয়নি। তাই উচ্চমাধ্যমিকে নম্বর অনেকটা কমে গিয়েছিল। কেন ওরকম হয়েছিল জানি না। আমাদের সময়ে জয়েন্ট আর উচ্চমাধ্যমিক একসঙ্গে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হত না। আগে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো করো, তারপর জয়েন্ট। আমরা ২০০০ সালে জয়েন্ট দিয়েছিলাম। তখন জয়েন্ট কোচিং হত পার্কসার্কাসে, সপ্তাহে দু-দিন। শনি-রবি। খলতপুর থেকে খেয়ে এসে সারাদিন ক্লাস করে জাননগর রোডে, আল-আমীনের সেই সময়কার কলকাতার ঠিকানায় রাত্রিযাপন করতে হত। সমস্যা হত রাতে ঘুমোনো নিয়ে। আমাদের সবার ঘুমোনোর জায়গা হত না। আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে কিছু ছাত্র ঘুমোতাম, কিছু ছাত্র জেগে থাকতাম, পড়তাম। প্রথম দল কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার পর তাদের তুলে দিয়ে দ্বিতীয় দল ঘুমোতে যেত। রবিবার ক্লাস করে রাতের দিকে বাস ধরে মিশনে ফিরতাম। অনেকদিন এমন হয়েছে, বাস মিশন অবধি আসেনি। তার মানে রাত হয়ে গেছে, লাস্ট বাস, যাত্রী কম, গিয়ে পোষাবে না, তাই নামিয়ে দেওয়া। অগত্যা বন্ধুরা সবাই হেঁটে হেঁটে অনেক রাতে ফিরে এসেছি মিশনে।" এত লড়াই করে পড়াশোনা করা ছাত্ররা আজ কোন জায়গায় আছেন? "আমাদের মধ্যে প্রথম হত মহম্মদ গোলাম নাজিবউদ্দিন। জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩১ র‍্যাঙ্ক করেছিল। জয়েন্ট মেডিকেলে ৫২ র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তার হয়েছে সাজ্জাদ হোসেন। দুই নাসির আহমেদ ছিল— একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক এখন। মুকান্দার সেখ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এখন অধ্যাপনা করছে, যার সম্পর্কে ইতিমধ্যে 'আল-আমীন বার্তা'য় লেখা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে অনেক জন। মহম্মদ বদরুদ্দোজা, ইমরোজ আহমেদ, ইউসুফ আলি, মহম্মদ সাইদুল আনাম, মানোয়ার আলি, সেখ মনিরুল ইসলাম— এরা সব ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরি করছে। প্রায় সকলেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।" আর মিনারুল ইসলাম? তার কথা একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

২০০০ সালে জয়েন্ট পাস করে মিনারুল মিশনেরই এক সিনিয়র দাদার পরামর্শে লেদার টেকনোলজি নিয়ে ভর্তি হন। বিষয়টা বিশেষ জানা ছিল না। ভর্তি হওয়ার পর কিছুদিন ক্লাস করে ভালো লাগছে না দেখে ঠিক করলেন, আবার জয়েন্ট পরীক্ষা দেবেন। যথাযথ পরামর্শ পেলে পছন্দের বিষয় নিয়েই পড়তে পারতেন, এক বছর নষ্ট হত না। কিন্তু সমস্যা হল সেক্রেটারি স্যারকে বলবেন কী করে? মিশন সেই প্রথম থেকেই শুধু তাঁকে ফ্রিতে পড়ায়নি, বই-খাতাপত্র সব জুগিয়েছে। কখনও কখনও বাড়ি যাওয়ার ভাড়াও দিয়েছে মিশন। আর জয়েন্ট কোচিং, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি তো করেছেই, ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়ছেন, তার জন্যও মাসে মাসে জি ডি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছে। কুণ্ঠা নিয়ে স্যারকে জানাতে না পেরে, স্যারের ঘনিষ্ঠ আইএএস নুরুল হককে কিছুটা জানিয়েছিলেন। প্রায় কাউকে কিছু না জানিয়েই মিনারুল পরের বছর জয়েন্টে বসেন। তখন পাঠরত গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি, সল্টলেক, কলেজেই ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে পরের বছর নতুন করে শুরু করলেন। পড়াশোনার সঙ্গে টিউশনি পড়ানোও শুরু করেন। মিশন যে তিন-সাড়ে তিন হাজার টাকা দিত, তা দিয়ে কলেজের টিউশনি ফি দিয়ে থাকা-খাওয়া বইপত্র কেনার জন্য কুলোত না। তাই টিউশনি শুরু করতে হয়। বি-টেক পড়া কালে যে-কম্পিউটার তাঁকে প্রয়োজনে কিনতে হয়েছিল, তার জন্য মূল্যবান জমিটাই বেচে দিতে হয়েছিল তাঁর আব্বা-মাকে। তাঁর আব্বার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন গ্রামের কেউ কেউ। ২০০৫ সালে বি-টেক পাস করেন মিনারুল। পাস করার পর আবার নতুন সমস্যায় পড়লেন। কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে সরকারি চাকরি নেই বললেই চলে। ছোটোবেলা

কর্মরত মহম্মদ মিনারুল ইসলাম।

থেকেই সরকারি চাকরি করার স্বপ্ন মিনারুলের। তাঁদের আত্মীয়স্বজন, যাঁরা অর্থশালী, সরকারি চাকরিবাকরি করেন বলে সম্মান পান সকলের। আর উলটে তাঁরাই অবজ্ঞা উপহার দেন মিনারুলদের। সেই উপেক্ষাই একটা জেদ তৈরি করেছিল শিশু বয়সেই। মিশনে আসার পর সরকারি চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন আরও মজবুত হয়। কিন্তু কোথায় সে-সুযোগ! নানা চেষ্টাচরিত্র শুরু করলেন। ২০০৬ সালে বেলেঘাটার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সিরামিক টেকনোলজি কলেজে পার্ট-টাইম লেকচারারের কাজ পান। মেসে থেকে পড়াশোনা, চাকরির খোঁজখবর সমানে চলতে থাকে। ২০০৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি অর্থাৎ একই সঙ্গে এম-টেক ও পিএইচডি করা শুরু করেন। চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলতে থাকে। মিনারুলের বিষয়ে সরকারি চাকরি কম আগেই বলেছি। মিনারুল মনস্থির করলেন একটা শূন্যপদ থাকলেও আবেদন করবেন। শূন্যপদ এক, পাঁচ কি পাঁচশো, তাতে কিছু যায় আসে না মিনারুলের। কারণ, তাঁর তো দরকার একটি পদ। ওই একটা পদের দিকে লক্ষ্য রেখেই যাঁরা এগোন, তাঁরাই সফল হন। মিনারুল সেই সাফল্যের নজির রাখতে পেরেছেন। ২০০৭ সালের ১৫ জুলাই পরীক্ষা পড়ল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশন পদের। শূন্যপদ পাঁচটি। এই চাকরিটিই করছেন মিনারুল। এই চাকরির পরীক্ষা-ইন্টারভিউয়ের সময়ও যে-ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন মিনারুল, তা জানলে তবেই বোঝা যাবে মিনারুলরা কেন সফল হন। ওই চাকরির পরীক্ষার সিট পড়েছিল আইআইটি খড়্গপুরে। রবিবার দিন পরীক্ষা। শনিবার পার্ট-টাইম পড়ানো থাকে। ছুটি নিয়ে পড়েছেন সারাদিন। রাত দশটা নাগাদ ফোন করলেন মিনারুলের প্রিয় টিপুভাই, "কাল একটু রামপুরহাট আসতে পারবি?" "কেন?" "দরকার আছে।" বললেন না কী দরকার। পরদিন হাওড়া থেকে খড়্গপুর যাওয়ার জন্য সকাল ছ-টা পাঁচের 'রূপসি বাংলা' ট্রেনে টিকিট কেটে বসে আছেন। ট্রেন ছাড়তে মিনিট পাঁচ বাকি। একটা ফোন এল। অন করতেই মিনারুল মায়ের কান্না শুনতে পেলেন। আব্বা প্যারালাইজড হয়ে গতকাল রামপুরহাট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মিনারুল হিসেব করলেন 'গণদেবতা' এক্সপ্রেসেরও সময় সকাল ছ-টা পাঁচ। টিকিট কেটে গিয়ে আর ধরতে পারবেন না। দুপুরের ট্রেন ধরে যেতে এমনিতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন জানিয়ে মাকে বললেন, "কয়েক জনকে ফোন করে বলেছি, ওরা যাবে, আর আমি পরীক্ষা দিয়েই যাব।" সব চিন্তাভাবনার সুতোগুলো আলগা হতে শুরু করল। যে-বইপত্র ট্রেনে পড়বেন বলে নিয়ে এসেছিলেন, তা সামনে খোলা আছে, চোখ বোলাচ্ছেন কিন্তু মাথায় কিছুই ঢুকছে না। এমন অবস্থাতেই মনকে শক্ত করে পরীক্ষায় বসে আশিটি প্রশ্নের মধ্যে পঁচাত্তরটির সঠিক উত্তর দিলেন। বিকেলে বাড়ি থেকে ফোন এল: তাড়াহুড়ো করতে হবে না, আব্বা ভালো আছেন, কাল এসো। "সেই যাত্রায় আব্বা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিছুদিন পর আব্বা আবার অসুস্থ হলেন, কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে এসে ভর্তি করলাম। মিশনের বন্ধু রাজা, রউফ, মনিরুল, সাজ্জাদ খুব সাহায্য করেছিল। সেপ্টেম্বরে লিখিত পরীক্ষার ফল বের হল। নাম ১০ নম্বরে। আব্বাকে ওই সেপ্টেম্বরেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। ২১ সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউয়ের তারিখ। হাসপাতালে আব্বার সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করে বললাম, পরীক্ষার জন্য কাল আসতে দেরি হবে। আব্বা দোয়া করলেন।" এরপর দু-আড়াই মাসের মাথায় ডিসেম্বরে মিনারুলের আব্বা মিনারুলদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর স্বপ্ন-আশার রূপায়ণ দেখে যেতে পারলেন না। প্রায় দু-বছর পর রেজাল্ট বের হল ওই পরীক্ষার। মিনারুল চাকরি পেলেন। মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের তালিকায় আরও একটা নাম যুক্ত হল। মিনারুল বর্তমানে মা-বোনকে নিয়ে সল্টলেকের সরকারি আবাসনে থাকেন। রামপুরহাটে জায়গা কিনেছেন। সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াকু মিনারুলের পরামর্শ: "ছাত্রছাত্রীদের সেলফ অ্যাসেসমেন্টের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। লোকের মুখে নানা সাফল্যের কথা শুনে মনে হবে সবগুলোই আমিও পারব। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তেমন না। আবেগহীনভাবে নিজের ট্র্যাক ঠিক করতে হবে।" আর জোর দিয়েছেন সরকারি চাকরির ওপর। "আর্থিক নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ত জীবন বলে কিন্তু নয়। সরকারি চাকরি নিলে একজন প্রশাসনের অংশীদার হতে পারেন। তাঁর চেয়ারের মূল্য অনেক। সরকারি চাকরির জন্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা দরকার। আর নিজেদের এগিয়ে যেতে হলে ইংরেজির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে যেকোনো প্রতিযোগিতায় সফল হতে গেলে। ক্লাস ফাইভ থেকেই ছাত্রছাত্রীদের 'যোজনা' ও 'কুরুক্ষেত্র' পত্রিকা পড়ানো উচিত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' পত্রিকা নিয়মিত পড়তে হবে।" সঠিক পরামর্শের অভাবে সংখ্যালঘু সমাজের অনেক মেধাই নষ্ট হয়ে যায়। কোন পথ ধরে কীভাবে এগোলে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছোনো যায়, তার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। মিনারুলদের মতো উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের এই লড়াই-পরামর্শই পথপ্রদর্শক আজকে। দিশাহীন সমাজকে যেমন পথ দেখিয়েছে আল-আমীন মিশন, তেমনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আল-আমীনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের সংগ্রামী জীবন গাইড বুক হয়ে উঠতে পারে। ভুল বললাম। পারে কেন? এক-একজন উজ্জ্বল প্রাক্তনীর জীবন এক-একটি গাইড বুকই। সন্দেহের কোনো জায়গা নেই। ■

সঠিক পরামর্শের অভাবে সংখ্যালঘু সমাজের অনেক মেধাই নষ্ট হয়ে যায়। কোন পথ ধরে কীভাবে এগোলে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছোনো যায়, তার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। মিনারুলদের মতো উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের এই লড়াই-পরামর্শই পথপ্রদর্শক আজকে।

দিশাহীন সমাজকে যেমন পথ দেখিয়েছে আল-আমীন মিশন, তেমনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আল-আমীনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের সংগ্রামী জীবন গাইড বুক হয়ে উঠতে পারে।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে যাঁরা সোনার হরফে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, খানবাহাদুর তামিজ খাঁ তাঁদের অন্যতম। তিনি বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুবাদক আর রচনাকার। অবহেলিত, কিন্তু কৃতবিদ্য এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হল এই পাতায়।

বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চা ও খানবাহাদুর তামিজ খাঁ

সাবির আলি

বাংলার প্রথম দিকে সবথেকে সফল মুসলমান তথা বাঙালি ডাক্তার ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে তামিজ খাঁর নাম সর্বপ্রথম রাখা যেতে পারে, যদিও তাঁর কীর্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চাকারী ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। তামিজ খাঁর সমসাময়িক ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন মধুসূদন গুপ্ত ও সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর মতো চিকিৎসকরা ইতিহাসে যতটা গুরুত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তামিজ খাঁ তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম হাওয়া সত্ত্বেও প্রায় বিস্মৃত। তাঁর সম্পর্কে তথ্য সামান্য হলেও, তা কিছু লেখার জন্য যথেষ্ট।

তামিজ খাঁর সম্পর্কে আমরা সবথেকে বেশি তথ্য পেয়ে থাকি তাঁর কাছের বন্ধু, বাংলার চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম কানাইলাল দে সম্পাদিত 'Calcutta Medical Speech' থেকে। পরবর্তীকালে কানাইলাল দে 'ভারতীয় মেডিকেল গেজেটে' তামিজ খাঁর মৃত্যুর সময় হিসেবে ১৮৮২ সালকে ঘোষণা করেন। কানাইলাল তাঁর স্মৃতিচারণে তামিজ খাঁর ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কানাইলাল দে তামিজ খাঁকে 'one of the most brilliant medicine mine' বলে উল্লেখ করেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তামিজ খাঁর জীবন সম্পর্কে সমৃদ্ধপূর্ণ বিশেষ কোনো তথ্য বর্তমান নেই। কানাইলাল দে জানিয়েছেন, তামিজ খাঁ জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি সজ্জন পরিবারে। তবে তিনি কলকাতা সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কারণ, তিনি প্রতিদিন কলকাতার কলিং ব্রাঞ্চ স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। তামিজ খাঁর জন্মের তারিখ বা সাল নিয়ে আমাদের কাছে তথ্য তেমন নেই। তিনি মুনশি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর পরবর্তী জীবনে নামকরণ হয়েছিল মুনশি তামিজ খাঁ। আমরা জানি যে, উনিশ শতকের শুরু থেকে মুনশি পদবিটি বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হত। মুঘল শাসনকালের প্রথম দিকে মুনশি পদবিটি কেবলমাত্র ইরানের উচ্চবংশজাত পরিবারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুরাও মুনশি পদবি ব্যবহার করতে পারত, বিশেষ করে আকবরের সময়কাল থেকে। আকবরের সময়কালে এই হিন্দু মুনশিদের উদারভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। হিন্দু সমাজে তাদের ধর্মীয় উদারতার জন্য মুঘল সমাজে তাদের বিশেষ ভূষিত করা হত। যাই হোক, অন্যান্য মুসলমান পরিবারের মতো তামিজ খাঁও বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ফারসি, বাংলা এবং সম্ভবত সংস্কৃত ভাষাতেও। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেননি। বাঙালি চিকিৎসক সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন, তামিজ খাঁ তেরো বছর বয়সের আগে পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাটাই শোনেননি।

স্কুল শেষ করার পর তামিজ খাঁ অবশ্য মনস্থির করেছিলেন, তিনি কলকাতায় একটি ওষুধের দোকান খুলবেন। কিন্তু ওষুধের দোকান খোলার জন্য প্রথমে তাঁর নিজের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের দরকার ছিল। এই শর্ত পূরণ করার জন্য প্রথমে তিনি সরকারি ওষুধের দোকানে কম্পাউনডার পদে যোগদান করেন। ওই সরকারি ওষুধের দোকানের তদারক পদে কর্মরত ছিলেন ডা. গ্রান্ট। তিনি ছোট্ট তামিজ খাঁর উৎসাহ ও বুদ্ধি দেখে খুব খুশি হন এবং ডা. এফ জে মৌটকে তামিজ খাঁর বিষয়ে জানান। ডা. মৌট তামিজ খাঁকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন কলকাতার মেডিকেল কলেজের ইংরেজি ক্লাসে ভর্তি হন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক তাঁর স্মৃতিকথায়

জানান যে, "By diligence and perseverance, the young Tamiz mastered the difficult science of medicine and acquired a mastery over the English language."। কিছুদিন পরে তামিজ খাঁ নিজের চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে তাঁর ক্লাসে শীর্ষস্থান দখলের জন্য Harding Prize পেয়েছিলেন। পরে তিনি অবশ্য পর পর দুই বছর ধাত্রীবিদ্যার জন্য গুডেফ স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

স্নাতক হবার পর তামিজ খাঁ প্রথমে কুমান ও তারপর লাহোরে চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত হন। হার্ডিং ১৮৪৫-১৮৪৬ সালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখ সাম্রাজ্যকে পুরোপুরিভাবে পরাজিত করেন এবং সেই দশকের শেষে শিখ সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। সেই সময় তামিজ খাঁ মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তের রাজধানী লাহোরে কর্মরত ছিলেন। তামিজ খাঁ চেয়েছিলেন যে, লাহোরে আরও অনেক বেশি করে বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলতে। আসলে তাঁর ইচ্ছা ছিল, ইউরোপীয় মেডিসিনকে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত করতে ও তাদের সমাজে তা জনপ্রিয় করতে। তিনি মনে করেছিলেন, শিখ সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে তা প্রচলিত হলে, তাদের মধ্যে জনসচেতনতার উদ্ভব ঘটবে।

লাহোরে দীর্ঘদিন থাকার পর তামিজ খাঁ কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হাউস ফিজিসিয়ান হিসেবে যোগদান করেন। মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার অ্যানাটমি বিভাগে শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ওই পদটি ফাঁকা থাকে এবং তামিজ খাঁকে ওই পদে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই ডা. শিবচরণ কর্মকার অসুস্থ হওয়ার কারণে তামিজ খাঁকে তাঁর মেটিরিয়া মেডিকা ক্লাসের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। এর পরে প্রসন্নকুমার মিত্রের মৃত্যু হওয়ার পর তামিজ খাঁকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান পদের জন্য মনোনীত করা হয়। পরে যখন দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ মেডিকেল কলেজ থেকে আলাদা করা হয়েছিল, তখন তাঁকে শিয়ালদার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের প্রথম ফিজিসিয়ান পদের জন্য যোগদান করতে বলা হয়েছিল।

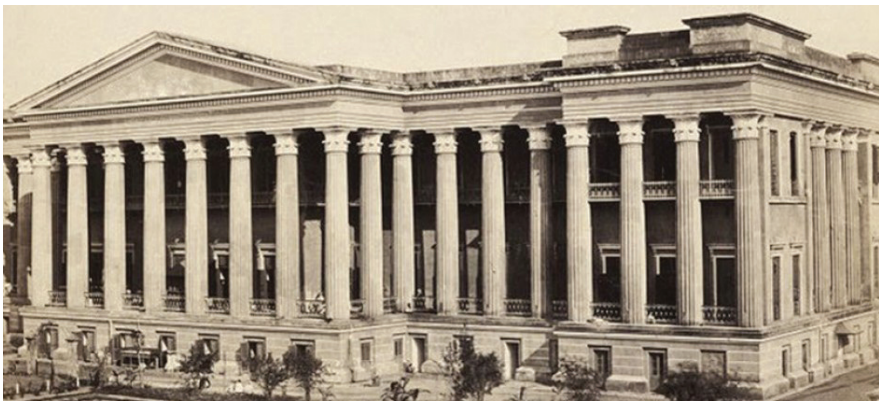

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের পুরাতন ভবন।

> কানাইলাল দে তামিজ খাঁকে 'one of the most brilliant medicine mine' বলে উল্লেখ করেছেন। দে আরও বলেছেন, "A Man of vest reading and very valuable professional knowledge, he was simple and unassuming as a child."।

কিছুদিন পরেই তামিজ খাঁ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং দায়িত্বময় ও কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও তিনি নিজেকে একজন দক্ষ চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি New Sydenham Society-র নিয়মিত সদস্যপদটি গ্রহণ করেন। পরে তিনি লন্ডনের Epidemiology Society এবং Australian Medical Journal-এর সাথে যুক্ত হন। কলকাতায় থাকাকালীন সেই সময় কনসেন্ট বিল পাশ করা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। এই বিলের প্রধান অংশ ছিল মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কত করা উচিত, তা ঠিক করা। এই বিষয়টি ঠিক করার জন্যে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয়। সেই উপদেষ্টা কমিটিতে অন্যতম সদস্য হলেন তামিজ খাঁ। তিনি প্রথম মেয়েদের বয়স সম্পর্কে মত জ্ঞাপন করেন।

১৮৭১ সালের ১ এপ্রিল ভারত সংস্কারক সভার পক্ষ থেকে কেশবচন্দ্র সেন মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসকদের অভিমত জানতে চান। এই মতপ্রদানকারীদের মধ্যে তামিজ খাঁ হলেন অন্যতম। তামিজ খাঁ বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়। তারই ফলে ভিন্ন আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় বসবাসকারী একই বয়সের মেয়েদের মধ্যে তুলনায় ভারতীয় মেয়েদের যৌবন শীঘ্রই শুরু হয়। সমাজের জীবনধারার অভ্যাস বয়সকে প্রভাবান্বিত করে। বিলাসবহুল আবহাওয়ায় যে-মেয়ের জন্ম ও লালন-পালন হয়, তার যৌবন প্রতিকূল আবহাওয়ায় জন্ম ও লালিত-পালিত সমবয়স্ক মেয়েদের তুলনায় অতি শীঘ্রই শুরু হয়। সেই বয়সের একটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত বলে গণ্য হলেও অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান ও জীবজগতের নিয়ম অনুসারে অতি অল্প বয়সের মেয়েটি স্ত্রীর কর্তব্য ও মায়ের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না। এই অবস্থায় উক্ত কাজের জন্যে তার ওপরে বলপ্রয়োগ করা হলে শীঘ্রই তার স্বাস্থ্য ও উদ্যম ভেঙে পড়বে। বৈজ্ঞানিক ও মনুষ্যোচিত দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে ষোলো বছরকেই একটি মেয়ের বিবাহযোগ্য বয়স বলে ধরা উচিত। যদি আরও বেশি বয়স হয় তাহলে ব্যক্তি ও বংশধরদের উন্নতি হবে।

তিনি কলকাতা মেডিকেল সোসাইটির অ্যানাটমিক্যাল ও প্যাথোলজিক্যাল বিভাগের অংশগ্রহণকারী সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এটওয়ালের বিশেষ অনুরোধে ইউনানি ওষুধ সম্পর্কে দিল্লির মহম্মদ মির্জা একটি স্মারকলিপি দাখিল করেন। অধ্যাপক তামিজ খাঁ তা অনুবাদ করে দেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন সুশ্রুতের আরবি অনুবাদ হল 'কিতাব-শুশ্রুদ-আল-হিন্দ'। ডা. আইন্সলির লেখা মেটিরিয়া মেডিকার

তামিজ খাঁর সমকালের
প্রখ্যাত চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কানাইলালের মতে, তামিজ খাঁ পড়ানোর ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে সর্বদা শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে কানাইলাল যখন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে পুরোনো ওষুধ সংরক্ষণ করার জন্য একটি মিউজিয়াম স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তামিজ খাঁ অ্যানাটমি ও প্যাথোলজি সামগ্রী সংগ্রহের প্রধান সংগ্রাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তামিজ খাঁ তৎকালীন বহু সরকারি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির অনুবাদের কাজে তাঁর অবদান। ১৮৫২ সালে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাংলা শ্রেণি স্থাপিত হয়। ওই শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বাংলা বইয়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাংলা বইয়ের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। 'সংবাদ প্রভাকরে' বলা হয়, "অবগত হইল মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্য্য একপ্রকার নির্ব্বাহ হইতেছে, ফলে তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না, যেহেতু শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকাদি অদ্যাপি কিছুই হয় না। এক লেকচারের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্ররা কি করিতে পারে? তাহারদিগের পাঠ্যপুস্তক না হইলে কোনমতেই সুফল দর্শিবেক না। এ বিষয়ে আমরা এডুকেশন কাউন্সিলকে অনুরোধ করি, ত্বরায় বিহিত মনোযোগপূর্ব্বক মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের দুরবস্থার উচ্ছেদ করুন।"

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোনো পাঠ্য বই না থাকায় ছাত্রদের ক্লাসে ও কর্মক্ষেত্রে নোটের ওপর নির্ভর করতে হয়। কখনও কখনও ভালো নোটের মালিকরা তাঁদের নোটের দৌলতে এই সুযোগে বেশকিছু রোজগারও করে নিত। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় হেকিম, কবিরাজ প্রভৃতি দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ হল দেশীয় ভাষায় অনূদিত অথবা প্রকাশিত বইয়ের পর্যালোচনা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বইয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করা।

এই অবস্থায় শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে এক বক্তব্য পেশ করা হয়। তৎকালীন প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞানের বইয়ে খুশিমতো বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারে যে-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা উল্লেখ করে চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় বই প্রকাশের জন্য সমভাবে প্রতিশব্দ স্থির করতে চিকিৎসক ও মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৮৭১ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনর এ-ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার জন্য ডব্লিউ এস অ্যাটকিনসন, ডা. এন সিবর, ডা. জে এওয়ার্ট, ডা. এস জি চক্রবর্তী, ডা. বি বি স্মিথ, খানবাহাদুর মৌলবি তামিজ খাঁ এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৭১ সালে সরকার যে-কমিটি গঠন করেন, খানবাহাদুর মৌলবি তামিজ খাঁ তাতে মতপ্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরিভাষা সম্পর্কে সেই কমিটির কাছে তিনি উল্লিখিত স্মারকলিপিটি পেশ করেন: ক. চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষাকে সংশোধন করতে হলে প্রাচীন চিকিৎসকদের মধ্যে যেসমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবি শব্দগুলি প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে যা বিস্মৃত হয়েছে, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। খ. সমস্ত আরবি ও সংস্কৃত শব্দগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়ের অনুকূলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেন: ১. কোনো শব্দবিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক ভাষায়, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হলে, তা অনুবাদ করতে হবে। ২. কোনো দুষ্প্রাপ্য শব্দ সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত না হলে তার আরবি ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে। আরবি অথবা সংস্কৃত প্রতিশব্দ না পাওয়া গেলে ইংরেজি শব্দকে অক্ষরান্তরিক করে ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইংরেজি বইকে উর্দু অথবা বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বাস্তব বা আপাত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিকারে তিনি নিম্নলিখিত পথগুলি সুপারিশ করেন।

তিনি মনে করেন, অনুবাদের মূল সমস্যা হল মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ খুঁজে বার করা। উর্দু ও বাংলায় পাঠদানের সময় তিনি ওই সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তাকে তামিজ খাঁ তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

প্রথম ভাগ: চিরপরিচিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি এই শ্রেণির অন্তর্গত। উর্দু ও বাংলায় এর প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ: চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমন অনেক শব্দ আছে, মাতৃভাষায় যার কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় ভাগ: ইংরেজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, মাতৃভাষায় অনুবাদের সময় যার কোনো বাস্তব অথবা আপাত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ শব্দ হল এই শ্রেণির অন্তর্গত।

ওই শব্দগুলি নিয়ে যে-সমস্যা, তা সমাধানের জন্য তিনি কিছু সুপারিশ করেন। যথা— ক. ভারতীয় ভাষায় ইংরেজিতে লিখিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো বইকে অনুবাদ করতে হলে আগেই দেখতে হবে ইউরোপীয় পরিভাষাগুলির কীভাবে সমাধান করা যায়। মাতৃভাষায় কি এগুলির কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায়? এগুলি কি মৌলিক অথবা নতুন? যেসব প্রতিশব্দ মাতৃভাষায় পাওয়া যায়, সেইসমস্ত ক্ষেত্রে ওইসব প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে বিষয় অথবা প্রবন্ধ অনুযায়ী আলোচনা করার আগে শিরোনামে ইংরেজি অক্ষরে মূল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গে মাতৃভাষায় প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে হবে। খ. ভারতীয় ভাষাগুলি প্রধানত সংস্কৃত, আরবি, ফারসি থেকে উদ্ভূত। এই সকল ভাষায় বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়েছে। অবজ্ঞাপ্রসূত সেইসমস্ত বইয়ের বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নয়। সেই জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দগুলি খুঁজে বার করা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হয়। একই কারণে মাতৃভাষায় প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও অনেক অনুবাদক নতুন প্রতিশব্দ তৈরি করতে বাধ্য হন। এইভাবেই চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তামিজ খাঁ বলেন, আগে

তামিজ খাঁ তৎকালীন বহু সরকারি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির অনুবাদের কাজে তাঁর অবদান। ... বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৭১ সালে সরকার যে-কমিটি গঠন করেন, খানবাহাদুর মৌলবি তামিজ খাঁ তাতে মতপ্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মাতৃভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইগুলি নিয়ে আলোচনা করায় তাঁর ভুলগুলি দূর হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইংরেজি বইতে যেসমস্ত শব্দ পাওয়া যায়, মাতৃভাষায় এর প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ভালো করে খুঁজলে দেখা যায় ফারসিতে 'জুল গুরেন' নামে প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যার প্রকৃত অর্থ 'যুগ্ম-স্পন্দন'। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, শুধু চিকিৎসকদের দ্বারা কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই অনুবাদ করলে তা সম্পূর্ণ ঠিক হবে এমন নয়, মাতৃভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই সম্পর্কে অনুবাদের ধারণা থাকা চাই, তাহলেই তিনি অনুবাদ করতে পারবেন। অপর দিকে মাতৃভাষায় সামান্য জ্ঞানসহ কোনো চিকিৎসক যদি মৌলবি অথবা পণ্ডিতের সাহায্যে ইংরেজিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির মাতৃভাষায় প্রকাশিত প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে চান, তিনি সঠিকভাবে তা বের করতে পারবেন না। তাই অনুবাদকের প্রথম কাজ হবে মাতৃভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই থেকে বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে সংগ্রহ করা, পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি প্রতিশব্দের সাথে একে তুলনামূলকভাবে বিচার করা। এই প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হলেই একমাত্র বিজ্ঞান বইয়ের অনুবাদ করা সম্ভব।

তিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন, ওই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে অনেক দেশীয় পরিভাষা পাওয়া যাবে। এর জন্যে মাতৃভাষার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত এমন একজন চিকিৎসক এবং একজন উপযুক্ত মৌলবি এবং একজন পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি একটি কমিটি করার সুপারিশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ওই কাজ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে উল্লিখিত বইগুলি ব্যবহার করতে তিনি সুপারিশ করেন: 1. 'Buhrool Juwahr', a Medical Dictionary by Hakeem Mahammad Bin Yousoof, ed. by Hakeem Abdul Majeed. 2. Dr. Tytler's Glossary in 'Unees-ool-Moosh-Shurraheen'. 3. Maulavie Hakeem Abdul Majeed's edition of Chughmeenee's 'Quanoocha'. 4. Dr. Breton's Medical Vocabulary. 5. Dr. F G Gladwin's Vocabulary. 6. Mr. Decosta's Contributions in Dr. Corbyn's Medical Journals. 7. Rev. Dr. Carey's Translation of Anatomy. 8. Baboo Khetter Mohon Dutta's Principal of Medicine. 9. Hudood-ool-Amruz. 10. Affauz'ool-Udweeah. 11. Reauz'ool-Udweeah. 12. Meeaur'ool-Amrauz.

এপিডেমিয়োলজি সোসাইটি। লন্ডন।

তৃতীয় পর্যায়ে এমন সমস্ত পরিভাষার কথা তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে মাতৃভাষায় যার কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। সংখ্যার দিক দিয়ে এগুলি তুচ্ছ নয়। তামিজ খাঁ বলেন, দু-ভাবে ওই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব— মাতৃভাষায় মূল শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করে ব্যবহার করা। অথবা এর গুরুত্ব বোধগম্য করার জন্য মাতৃভাষায় নতুন শব্দের ব্যবহার করা। উভয় পদ্ধতিকে সমর্থন করার মতো যুক্তি থাকলেও তিনি মনে করেন সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে এগুলির অর্থবহ কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে ইংরেজি, লাতিন অথবা গ্রিক শব্দটিকে হুবহু ব্যবহার করাই যুক্তিসংগত।

যাই হোক, তামিজ খাঁ সব থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। ডা. দুর্গা করের পুত্র ডা. রাধাগোবিন্দ কর, যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, তিনি একটি জনপ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ডা. রাধাগোবিন্দ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করার উৎসাহ তাঁর বাবার কাছ থেকে পাননি, পেয়েছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় দুই শিক্ষক ডা. কানাইলাল দে ও ডা. তামিজ খাঁর কাছ থেকে। তামিজ খাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তাঁর ছাত্ররা ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করেছিলেন নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে। তামিজ খাঁ তাঁর সমগ্র জীবনে বহু পুরস্কারে ও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল 'খানবাহাদুর' উপাধি।

তামিজ খাঁ প্রায় দীর্ঘ দু-মাস ব্যাপি জ্বরে ভোগার পর ১৮৮২ সালের জুন মাসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অসুস্থতার সময় চিকিৎসা করেছিলেন তাঁর অনুগত ছাত্র ডা. সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। তামিজ খাঁ একজন অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষক ছিলেন, ফলে তাঁকে দেখে পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্ররা উৎসাহিত হয়েছিলেন। দেশীয় ছাত্ররা যখন কোনো বাঙালি চিকিৎসককে দেখে উৎসাহিত হবার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁদের কাছে উদাহরণস্বরূপ কেউ ছিলেন না। তামিজ খাঁ সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য একেবারে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। খাঁ যেমন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, ঠিক সেরকমই ১৮৭৯—১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সার্জারির অধ্যাপক ও ভাইসরয়ের সহকারী সার্জেন মৌলবি জাহিরুদ্দিন আহাম্মেদ বাংলার এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। তামিজ খাঁ পরবর্তীকালের মুসলমান তথা বাঙালি ছাত্রদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় আসার জন্য তীব্র অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন এবং শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য ওষুধকে বই থেকে মানুষের মাঝে জনপ্রিয় ও ব্যবহারের জন্য একটি সেতুবন্ধকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কানাইলাল দুঃখ করে বলেছিলেন, "Though a man of a vast reading and very valuable professional knowledge, he was simple and unassuming as a child; I need not say that loss we mourn today will not be soon and easily repaired."

তবে আমাদের মাঝে একটি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান শাস্ত্রের এত বড়ো পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁকে কানাইলালের মতো চিকিৎসক 'চিকিৎসাবিজ্ঞান শাস্ত্রের পথিকৃত' বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐতিহাসিকদের এত অবহেলা কেন? তাঁর সমসাময়িক মধুসূদন গুপ্ত ও সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর মতো চিকিৎসকরা যতটা গুরুত্ব ও কৃতিত্ব পেয়েছেন বা তাঁদের সম্পর্কে এত এত লেখা হয়েছে অথচ তাঁদের কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও তামিজ খাঁ সম্পর্কে লেখা এত কম কেন? এর উত্তর হিসেবে আমরা কোন বিষয়কে তুলে ধরতে পারি— তাঁর সম্পর্কে তথ্যের অভাব, না কি অন্য কিছু? নথির অপ্রতুলতা তো সমসাময়িক প্রত্যেক চিকিৎসকের ক্ষেত্রেই ছিল। বাকি সবার ক্ষেত্রে লেখা হলেও তামিজ খাঁ সম্পর্কে লেখা হল না কেন? যাই হোক, সবশেষে আমরা এ-কথা বলতে পারি যে, এই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে আমরা যদি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বাঙালি ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের দিকটি ফুটে উঠবে, তেমনি বাঙালির চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের গৌরবের দিকটিও প্রস্ফুটিত হবে। ■

বনের ভাব ও চরিত্র তার স্তব্ধতা। তবু নীরব এই পরিবেশে পোকামাকড়ের ডানার আওয়াজ ধ্বনির যে-মাধুর্য রচনা করে, তার ব্যঞ্জনা গভীর। এও তো ভাষা— ব্যক্ত করতে সক্ষম অন্তরের কথা। মনুষ্যেতর প্রাণীদের এইসব ভাষা নিয়ে একটি বৃশ গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। লিখেছেন

ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ

মৌচাকে গুপ্তচর

প্রযুক্তিবিদরা বহুকাল বুঝতে পারেননি, কেন বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফরমারগুলি প্রায়শই মশায় ঠাসা হয়ে থাকে। কীট-পতঙ্গারা এখানে কীসের আকর্ষণে আসে, কেন বিনাশের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের এত প্রয়াস? হতে পারে বিদ্যুতের এমন কোনো ধর্ম, যা লোকের কাছে এখনও অজ্ঞাত, অথচ মশাদের পরিচিত?

ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা যখন এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দেখা যায়, বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় মাথার ওপর গোধূলি বেলায় ঘুরে ঘুরে উড়ছে মশার দল। মশাদের পুরো ঝাঁক। ওরা নাচে আর গায়। ওদের কণ্ঠস্বর অবশ্য দুর্বল, কিন্তু তাহলেও ঘাসের মধ্যে বসে থাকা গঙ্গাফড়িংদের মতো মশারাও নিজেদের জাহির করতে চায়। কিন্তু গঙ্গাফড়িংদের অবস্থা ভালো— ওরা জোরে কথাবার্তা বলতে পারে। সে তুলনায় মশাদের অবস্থা খারাপ— তাদের সংকেত দূর থেকে শোনা যায় না। এই কারণে তারা দলবদ্ধ হয়ে সমস্বরে গান গায়। একসঙ্গে মেলার ফলে অবশ্য অনেকটা জোরদার হয়। মশাদের ঐকতান শুনতে পেয়ে তাদের সঙ্গিনীরা উড়ে আসে। দেখতে দেখতে নৃত্যরত মশাদের কাছে উড়ে এল এক স্ত্রী-মশক, সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ধেয়ে এল জনৈক স্তাবক। তারপর উড়ে এল আরেকটি স্ত্রী-মশক, আরও একটি এবং চতুর্থ ও পঞ্চম— সবার ক্ষেত্রেই ঘটল সেই একই ব্যাপার। অথচ ষষ্ঠটিকে কেন যেন কেউ আমল দিল না। সপ্তম ও অষ্টমটিকেও নয়, আবার নবমটি ও দশমটিরও ভাগ্য ভালো দেখা গেল। ব্যাপারটা কী? প্রশ্ন উঠতে পারে, ট্র্যান্সফরমারের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বিজ্ঞানীরা আরও একটি জিনিস আবিষ্কার করলেন। যেমন, সকলেরই জানা আছে যে, গিটারের তারে সুর ওঠে একমাত্র তখনই যখন তাকে ছোঁয়া হয়। আর তাতে সুর উঠবে কাঁপন লাগার ফলে। তার যত সরু হবে আওয়াজও তত মিহি হবে, কেননা, সরু তারে কাঁপন ধরে অনেকটা দ্রুত আর মোটা তারে অপেক্ষাকৃত ধীরে। তার মানে, কাঁপন যত বেশি, আওয়াজ তত উঁচু পর্দায়, আর কাঁপন যত কম আওয়াজ তত নীচে। এটা কেবল তারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কোনো একটা পাতলা ডাল দুলিয়ে দেখো— সাঁই সাঁই আওয়াজ হবে। যত ঘন ঘন দোলাবে সাঁই সাঁই আওয়াজটা তত তীক্ষ্ণ হবে। আর কীট-পতঙ্গের পাতলা ফিনফিনে ডানা, যা অতি দ্রুত নড়তে থাকে? হ্যাঁ, তা থেকেও একরকম আওয়াজ বেরোবে বই কী। কাঁপনের দ্রুততার ওপর নির্ভর করে এই সুর নীচু পর্দার হতে পারে, খাদের হতে পারে, আবার পিনপিন আওয়াজের মতো সূক্ষ্ম হতে পারে।

কীট-পতঙ্গের ডানা নানা ধরনের, সেগুলি নানা দ্রুততায় কাঁপতে পারে। যেমন, মাছি সেকেন্ডে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো বার পাখা নাড়ে, মৌমাছি তিনশো বার, যখন সে মধু নিয়ে ওড়ে আর যখন বোঝা ছাড়া ওড়ে তখন চারশো চল্লিশ বার, ভ্রমর সেকেন্ডে একশো নব্বই থেকে দু-শো চল্লিশ বার পাখা নাড়ে, আর মশা নাড়ে পাঁচশো থেকে ছ-শো বার (কোনো কোনো জাতের মশা এক হাজার বার পর্যন্ত), বোলতা আড়াইশো বার, গোমাছি

মশা।

একশো বার, ঘাসফড়িং চল্লিশ থেকে একশো বার, গয়াল পোকা পঁচাত্তর বার, মে-পোকা পঁয়তাল্লিশ বার, মথ পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ বার, পঙ্গপাল কুড়ি বার, ইত্যাদি।

পরস্পরের স্পন্দনের মধ্যে যেহেতু এতটা প্রভেদ, সেহেতু ওই স্পন্দনের ফলে যে-ধ্বনি ওঠে, তাও সম্ভবত বিভিন্ন রকমের। হ্যাঁ, তা-ই বটে। আর এখানেই বিজ্ঞানীরা ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝতে সাহায্য করলেন, ট্র্যান্সফরমারের দিকে মশারা যে উড়ে আসে, তার কারণ কী। ট্র্যান্সফরমার গুনগুন করে। এই আওয়াজ বহু কীট-পতঙ্গ শুনতে পায়, কিন্তু এতে আকৃষ্ট হয় কেবল মশারাই, কেননা, স্ত্রী-মশকরা সেকেন্ডে পাঁচশো-সাড়ে পাঁচশো বার ডানা নেড়ে যে-আওয়াজ তোলে, এটা তার মতো। অতি সূক্ষ্ম পিনপিনে আওয়াজের মতো শুনতে এই আহ্বানসংকেত অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

কিন্তু আরও অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে গেল: পুং-মশারা কোনো কোনো স্ত্রী-মশকের প্রতি মনোযোগ দেয়, আবার কারো কারো প্রতি দেয় না— এমন হয় কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সময় লাগল। লোকে বার বার করে মশাদের ওড়া অনুসন্ধান করে দেখল সেকেন্ডে কতবার তাদের ডানা কাঁপে, এ-সময় যে-ধ্বনি ওঠে, তা মনোযোগ দিয়ে শুনল। এর ফলেই বোঝা গেল যে, মশারা

মাছি।

বিভিন্ন ছাঁদে পিনপিন আওয়াজ করে। স্ত্রী-মশকরা পুং-মশাদের তুলনায় সামান্য তীক্ষ্ণ। মানুষের কানে অবশ্যই তফাতটা ধরা পড়বে না। কিন্তু মশারা তা চমৎকার ধরতে পারে। আবার স্ত্রী-মশকরাও সকলে যে একই ছাঁদে পিনপিন করে, তাও নয়: একেবারে ছোটো যারা, তারা বড়োদের মতো নয়, আবার বুড়িরা— ওদের কারো মতোই নয়। পুং-মশারা তা শুনতে পায়। ছোটোদের আর বুড়িদের দিকে তারা মনোযোগ দেয় না: একদলের এখনও সময় হয়নি বনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গার মাথার ওপর নাচ-গান করার, অন্যদের সে-সময় পেরিয়ে গেছে।

কেবল বসন্তকালে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করার সময়ই কিন্তু মশারা কথাবার্তা বলে না।

মশারা সর্বদা একই গতিবেগে ওড়ে না: কখনও দ্রুত, কখনও-বা অপেক্ষাকৃত ধীরে। এর অর্থ হল— ডানা নাড়ে কখনও ঘন ঘন, কখনও-বা কম। এরই ফলে ধ্বনি হয় নানা রকমের— উঁচু অথবা নীচু পর্দার, জোরে, আস্তে কিংবা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ।

মশারা— জাতহিসাবি, অমনি অমনি তাড়াহুড়ো করে না, অনর্থক শক্তিক্ষয় করে না। কিন্তু সেই মশাও যখন দ্রুত ওড়ে তখন বুঝতে হবে, তার বড়ো দরকার পড়েছে। যেমন, টের পেল কোথায় ফায়দা ওঠানো যায়, অমনি সেখানে ছুটল। জোর ডানা নাড়ায়। কিন্তু অন্যেরাও ঝিমোয় না— নজর রাখে। "ও এমন ছুটছে কেন? এসো দেখি, শোনা যাক।"— ওরা কান পেতে শোনে। এদিকে মশা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে, জোরে জোরে পাখা ঝাপটে বাতাস কেটে চলেছে, আর যেন বলছে: "খাবার আনতে চলেছি, ওই তো খাবার, কোথায় খাবার আছে জানি।"

অন্যেরাও তার পিছু পিছু রওনা দেয়।

আবার এমন ঘটনাও ঘটে, যখন মশাকে বিপদের হাত থেকে— যেমন, ধোঁয়া বা আগুন থেকে পালাতে হয়। তখন সে তার মশকীয় মনোবল পুরোপুরি প্রয়োগ করে ধেয়ে যায়, চূড়ান্ত গতিতে ডানার সাহায্যে কাজ করে। মশা পালাতে থাকে, তার ওড়ার আওয়াজ হতে থাকে বিশেষ ধরনের। পলায়নরত মশা ডানার সাহায্যে যে-আওয়াজ তোলে, অন্য মশাদের কাছে তা হল সংকেতবার্তা: আপন প্রাণ বাঁচা।

ডানার সাহায্যে মশারা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, নিজেদের অবস্থিতি এবং আরও অনেক কিছু জানায়।

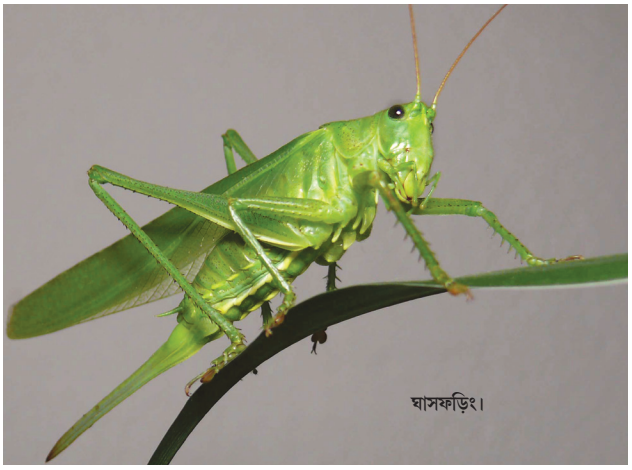
ঘাসফড়িং।

তোমরা তো জানই যে, ফুলের মধুর ভার নিয়ে ওড়ার সময় মৌমাছি সেকেন্ডে প্রায় তিনশো বার ডানা নাড়ায়। আর ভার ছাড়া যখন ওড়ে তখন ওই একই সময়ে চারশো পঞ্চাশ বার ডানা নাড়ায়। তার মানে ভারবাহী মৌমাছির ডানার আওয়াজ হবে মৃদুতর। মৌমাছিরা এই পার্থক্য বহুকাল হল আয়ত্তে এনেছে, এমনকী তারা দূর থেকে জানতে পারে, তাদের বান্ধবীটি ভার নিয়ে উড়ছে না ভার ছাড়া উড়ছে। এটা কেবল যে নিছক কৌতূহলের খাতিরে জানা দরকার, তা নয়, কেননা, তাদের মধ্যে সৎ পরিশ্রমী ছাড়াও এমন কেউ কেউ আছে, যারা অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে ইতস্তত করে না। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে, বিন্দু বিন্দু সুধা সংগ্রহের জন্য উদয়াস্ত খাটতে তাদের মন চায় না, তাই অন্য মৌমাছিদের সংগৃহীত মধু চুরি করার উদ্দেশ্যে তারা অপরের মৌচাকে হানা দেওয়ার মতলব করে। বাইরে থেকে এ-ধরনের নিষ্কর্মারা দেখতে অনেকটা শ্রমিক মৌমাছির মতো, তাই তারা যে-কাউকে ঠকাতে পারে। তবে মৌচাকের প্রবেশপথে যারা থাকে, সেই পাহারাদার মৌমাছিদেরই কেবল পারে না। এই মৌমাছিরা দূর থেকে শুনতে পারে কে উড়ে আসছে: ভারবাহী মৌমাছির ডানা তাদের বলে দেয়— আপনজন! পাহারাদাররাও শ্রমিক মৌমাছিকে অবাধে মৌচাকে প্রবেশ করতে দেয়। আর যে চোর, সে ধরা পড়ে যায় ডানার আওয়াজে, পাহারাদার মৌমাছিরা তাকে নিজেদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় না।

ভ্রমর।

মৌমাছির ডানার আওয়াজ প্রবেশের

বোলতা ও তার বাসা।

ছাড়পত্র মাত্র নয়। মৌচাকে উড়ে আসার পর সে ডানার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে কোথায় ছিল, কী দেখেছে, কী পেয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় সাক্ষাৎকারের বিবরণ সে দিতে অক্ষম। কিন্তু মৌমাছিদের একমাত্র স্বার্থ হল ফুল— কোথায় ফুল আছে, তাতে সুধা আছে কি না, সে ফুলই-বা কেমন। তোমাদের এখন জানা আছে যে, কোনো কোনো তথ্য মৌমাছিরা পেয়ে থাকে গুপ্তসন্ধানী মৌমাছির সঙ্গে করে বয়ে আনা গন্ধের কল্যাণে। কিন্তু গন্ধ দিয়ে সব কথা ব্যক্ত করা যায় না। যেমন, মৌমাছিদের প্রয়োজনীয় ফুল কত দূরে আছে, তার বিবরণ দেওয়া যায় না। গুপ্তসন্ধানী মৌমাছি এ-কথা জানায় পাখার চটচট আওয়াজে। আর জানায় রীতিমতো সঠিকভাবে: সে যদি আধ সেকেন্ডের সামান্য কম সময় চটচট আওয়াজ করে, তাহলে বুঝতে হবে ফুল আছে শ দুয়েক মিটার দূরে। বিখ্যাত জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী হ্যারলড অ্যাশ মৌমাছিদের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন যে, পাখার চটচট আওয়াজের স্থিতিকাল (চটচট আওয়াজেরই কথা হচ্ছে, কেননা, মৌচাকে মৌমাছি ওড়ে না, সে ডানা ফড়ফড় করে ছুটে বেড়ায়) কেবল দূরত্বের সঙ্গেই যুক্ত নয়, খুঁজে পাওয়া খাবারের উৎকর্ষের সঙ্গেও বটে। গুপ্তসন্ধানী মৌমাছি যত মরিয়া হয়ে চটচট আওয়াজ তোলে, সন্ধানপ্রাপ্ত খাবারও তত ভালো বুঝতে হবে।

একবার বিজ্ঞানী একটা কৃত্রিম মৌমাছি বানালেন, তাকে মৌমাছিদের ধাঁচে ডানা ফড়ফড় করতে শিখিয়ে মৌচাকে ছেড়ে দিলেন। মৌমাছি নড়েচড়ে চটচট আওয়াজ তোলে আর তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে অন্য মৌমাছিরা— নকল মৌমাছি যেদিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, সেখানে রওনা হওয়ার জন্য তারা তৈরি হয় (এই মৌমাছিটার ডানার চটচট আওয়াজের স্থিতিকাল হয় ০.৪ সেকেন্ড, যার অর্থ: সন্ধানপ্রাপ্ত ফুল আছে দু-শো মিটার দূরে)। কিন্তু অ্যাশ যত দূরদর্শীই হোন-না-কেন, মনে হল তিনি পুরোপুরি শেখাতে পারেননি। চাকের মৌমাছিদের কাছে কী একটা ব্যাপার যেন দুর্বোধ্য রয়ে গেল, তাই তারা ব্যাখ্যা কিংবা অতিরিক্ত তথ্য দাবি করল। কিন্তু কৃত্রিম মৌমাছিটা কেবল ডানা ফড়ফড়ই করতে পারে, দিতে পারে কেবল নির্দিষ্ট সংকেত। মনে হল মৌমাছিরা কোনো একটা ব্যাপারে তাদের বান্ধবীটির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে অথবা ধরে নিয়েছে যে, তার মাথার গোলমাল হয়েছে, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেরে ফেলল।

পাতা বয়ে নিয়ে চলা পিঁপড়েরা।

মথ।

অ্যাশ আবার সেই একই পরীক্ষা চালালেন, এবারেও মৌমাছিরা কৃত্রিম গুপ্তসন্ধানীটিকে মেরে ফেলল। এরকম অনেক বার চলল। অবশেষে বিজ্ঞানী জানতে পারলেন ব্যাপারটা কী: দেখা যাচ্ছে গুপ্তসন্ধানী মৌমাছির বিবরণের পর মৌমাছিদের মধ্যে কেউ-একজন ডানার সাহায্যে আওয়াজ তুলে যেন বলে: বুঝলাম! এরপর গুপ্তসন্ধানীর কাজ হবে যে-সুধা সে এনেছে, তার গন্ধ ওই মৌমাছিটিকে শুঁকতে দেওয়া। কিন্তু কৃত্রিম মৌমাছি আগের মতোই নড়তেচড়তে থাকে। তখনই তার আচরণে রুষ্ট হয়ে মৌমাছিরা অনাহূত অতিথিকে হত্যা করে।

এটা বোঝার পর অ্যাশ তাঁর কৃত্রিম মৌমাছিকে বিধিমতো আচরণ করতে শেখালেন, এবারে আর ওরা তাকে হত্যা করল না।

তবে কেবল মানুষই যে জাল মৌমাছি তৈরি করতে পারে, তা নয়। স্বয়ং প্রকৃতি বেশ কিছু মেকি তৈরি করে রেখেছে— যেমন, নানা রকমের মাছি আছে, যারা বোলতা ও মৌমাছির মতো দেখতে। এরা বোলতা-জাতের ও মৌমাছি-জাতের— এই নামেই পরিচিত। বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন— দেখা গেছে, প্রতারকদের বাহ্যিক চেহারাই যে কেবল এই মাছিদের শত্রুদের বিভ্রান্ত করে দেয়, তা নয়। বোলতা-জাতের ও মৌমাছি-জাতের পতঙ্গারা যাদের অনুকরণ করে, তাদেরই মতো একই বেগে তারা পাখাও নাড়ে। বোলতা-জাতের কিংবা মৌমাছি-জাতের এ-ধরনের পতঙ্গারা উড়তে উড়তে আশেপাশের সকলকে জানায়, "আমি মৌমাছি, আমি মৌমাছি!" কিংবা "আমি বোলতা, আমি বোলতা!"

মৌমাছি।

ফলে কেউ তাকে স্পর্শ করে না— হুলের খোঁচা খেতে কারই-বা সাধ যায়!

চেহারায় এবং কণ্ঠস্বরেও যদি সে সত্যিকারের মৌমাছি অথবা বোলতার মতো হয়, তাহলে প্রতারণা কীভাবে ধরা পড়বে?

গ্রীষ্মকালে বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফুল আর উত্তপ্ত মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, মধু আর রজনের গন্ধ পাওয়া যায়। বাতাস ভারী ভারী ঠেকে, যেন এগুলির গন্ধে ভরপুর। আর বলাই বাহুল্য, নীরবতা। আশ্চর্য বনের এই বিশেষ নীরবতা, তাতে বিকীর্ণ হয় হাজার হাজার নানাবিধ ধ্বনি, অথচ নীরবতা ভঙ্গ হয় না। সেইসব ধ্বনির মধ্যে আছে মৌমাছির গুনগুন আওয়াজ আর গঙ্গাফড়িংয়ের ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজ, ফড়িংয়ের ডানার ফড়ফড়ানি আর মশার পিনপিন ডাক। কীট-পতঙ্গারা কথাবার্তা বলছে। কীসের কথা? কিছু কিছু আমরা ইতিমধ্যেই জানি। কিন্তু আরও অনেক অনেক কথা আমাদের জানতে বাকি রয়ে গেছে।

আর আশ্চর্য হওয়ারও আছে। ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৪ সালের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫৯৯ স্থানাধিকারী

তারিক আহমেদ

পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই

- এবার, ২০১৪ সালের জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় আল-আমীন মিশন থেকে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক (৫৯৯) তোমার। কেমন লাগছে?
- ভালো লাগছে।
- সবচেয়ে খুশি কে?
- মা।
- মা ছাড়া আর কে আছেন বাড়িতে?
- আমরা চার ভাই চার বোন। দু-বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বাড়িতে চার ভাই, দু-বোন আর মা— এই আমাদের বর্তমান সংসার।
- আর আব্বা?
- আব্বা অন্যত্র আলাদা থাকেন, ছোটোমার সঙ্গে। আমরা প্রথমপক্ষের সন্তান। আব্বার পারিবারিক ভিটেতেই থাকি আমরা।
- তাহলে তো বেশ সমস্যা। কীভাবে ম্যানেজ করেন তোমার মা? জমিজমা আছে?
- না, জমিজমা নেই। পাকা-কাঁচা মিলে তিন কামরা বাড়িতে থাকি আমরা। মা একসময় তাঁত বুনতেন, এখন দাদারা রোজগার করেন, সেই পয়সাতেই চলে।
- দাদাদের তাহলে তো পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে?
- হ্যাঁ, হয়েছেই তো। বড়দা ক্লাস এইট পর্যন্ত, মেজদা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছেন। ছোটোভাই ক্লাস এইটে পড়ছে।
- আর বোনদের পড়াশোনা?
- যে দু-বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদের একজন উচ্চমাধ্যমিক পাস, একজন গ্র্যাজুয়েট। সেজোবোন বিএ পড়ছে, ছোটো ক্লাস ফোরে।
- আব্বা কী করেন এখন?
- আব্বার তো পড়াশোনা কম, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। এই পড়াশোনা নিয়ে আগে অনেক কিছু করেছেন। বড়ো ব্যাবসা ছিল। বাস, ট্রাকটরও ছিল। লস হয়ে সেসব উঠে গেছে। আব্বা এখন কাঠের কাজ করেন। লোক নিয়ে ফার্নিচার তৈরি করে বিক্রি করেন।
- তোমার পড়াশোনা কীভাবে এগোল?
- বীরভূম জেলার মুরারই থানার কাশিমনগরে আমাদের বাড়ি। বাড়ির কাছে কাশিমনগর সিরাজুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি। ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত পাইকর হাইস্কুলে।
- বাড়ি থেকে কত দূরে? কীভাবে যেতে স্কুলে?

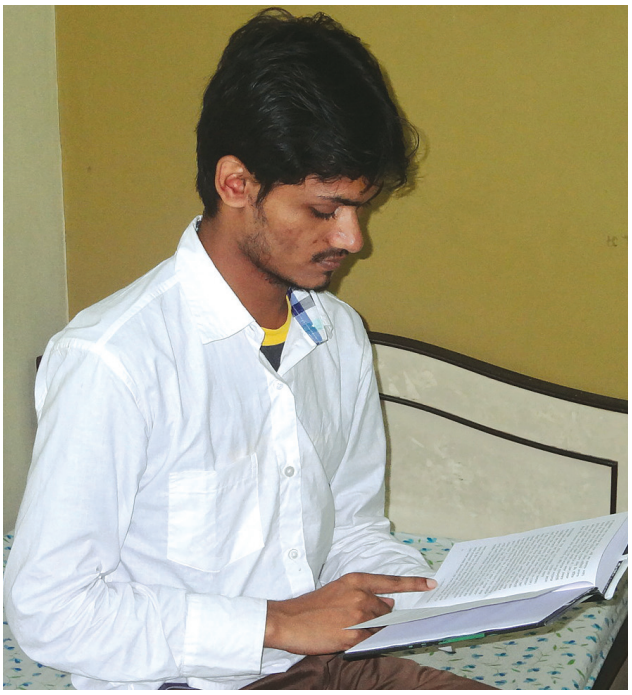

তারিক আহমেদ।

- আড়াই কিলোমিটারের মতো হবে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত হেঁটে যেতাম। এক বছর সাইকেলে গিয়েছি।
- কেমন রেজাল্ট করতে?
- প্রাইমারিতে প্রথম হলেও, হাইস্কুলে গিয়ে ফোর্থ-ফিফথ হতাম।
- ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড হওয়া বন্ধুরা কী করছে এখন?
- যে ফার্স্ট হত, ফিজিক্স অনার্স করছে। সিডিউল কাস্টের বিশেষ সংরক্ষণ ওর বড়ো কাজে লেগেছে। অন্য দু-জন উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়ে পাস করতে পারেনি।
- আর ফোর্থ জন ইঞ্জিনিয়ার হতে চলল। এটা কী করে সম্ভব হল?
- আল-আমীন মিশনের জন্যই বলতে পারেন। আল-আমীন না থাকলে আমার দাদার মতো আমাকেও কাজে লেগে যেতে হত, নয়তো বন্ধুদের মতো হাল হত।
- আল-আমীন মিশনে কীভাবে এলে?
- মুরারই থেকে ফর্ম তুলে রামপুরহাটে ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমাদের স্কুলের সাত-আট জন বন্ধুর মধ্যে তিন জন ভর্তি হতে পেরেছিলাম। খলতপুরে ইন্টারভিউ হয়েছিল। মা আর মেজোদাদা এসেছিলেন সঙ্গে।
- ভর্তির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কীরকম প্রস্তুতি নিয়েছিলে?
- আমাদের ক্লাসের যে-বন্ধু আল-আমীন মিশনের খবর দিয়েছিল, সে আগের বছরেও পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। তার সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুলের বই পড়া ছাড়াও আরও কিছু বই পড়েছিলাম। ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে মনে হয়েছিল চান্স পাব না।
- কিন্তু পেয়েছিলে ...
- হ্যাঁ। সাত-আট জনের মধ্যে তিন জন। আগের বছর যে-বন্ধু পায়নি, সেও পেয়েছিল।
- আবাসিক হয়ে পড়াশোনা করার খরচ তো অনেক, কীভাবে ম্যানেজ করলে?
- আমাদের বিশেষ খরচ করতে হয়নি। স্যার, মানে আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি মা-দাদার কাছে পরিবারের সব কথা শুনে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পড়ার সুযোগ করে দেন। আর আমার বাকি দুই বন্ধুও ফ্রিতেই পড়েছে।
- কেন, ওদের আব্বারা কী করেন?
- দুজনের আব্বাই চাষবাস করেন। আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো নয়।
- তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভালো র‍্যাঙ্ক করলে, বাকি দুই বন্ধু কী করছে?
- একজন, এবাদত আমার আগেই রানিং ইয়ারে র‍্যাঙ্ক করে যাদবপুরে ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আর-একজন, জাহিরউদ্দিন জয়েন্ট মেডিকেলে ৩৮০০ র‍্যাঙ্ক করেছিল। ভর্তি হতে পারেনি। মিশনেই জয়েন্টের কোচিং নিচ্ছে এখন।
- তুমি তাহলে কত বছর আল-আমীনে পড়লে?
- নাইন-টেন, ইলেভেন-টুয়েলভ, আর জয়েন্টের কোচিং এক বছর— মোট পাঁচ বছর।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যকি কেমন রেজাল্ট হয়েছিল?
- আমি মিশনের ধুলিয়ান শাখা থেকে ২০১১ সালে মাধ্যমিক দিয়ে ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম। ওই বছর মাধ্যমিকে ধুলিয়ান শাখার সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৮৯.৫ শতাংশ। আর মিশনের সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৯১.৫ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিলাম পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে ২০১৩ সালে। পেয়েছিলাম ৭৭.৬ শতাংশ। আমাদের শাখার সর্বোচ্চ নম্বর ৮৪.৪ শতাংশ আর মিশনের ৯১.৮ শতাংশ ছিল।
- উচ্চমাধ্যমিকে তো তোমার ভালো হয়নি তেমন?
- হ্যাঁ। রেজাল্ট দেখে দাদা মুখে কিছু না বললেও, কষ্ট পেয়েছিলেন। সেটা বুঝতে পেরেই জয়েন্টের জন্য আরও পরিশ্রম শুরু করি।
- তুমি মাধ্যমিক দিয়েছ ধুলিয়ান থেকে, উচ্চমাধ্যমিক পাথরচাপুড়ি আর জয়েন্ট বর্ধমান থেকে— এই তিন শাখার কোন জায়গা কেমন লাগল।
- সব ক-টাই ভালো লেগেছে। তবে বর্ধমান বেশি ভালো লেগেছে আজিজুল স্যারের জন্য।
- দৈনন্দিন পড়াশোনা কীভাবে করতে?
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সময় মিশনের নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক।

আমাদের বিশেষ খরচ করতে হয়নি। স্যার, মানে আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি মা-দাদার কাছে পরিবারের সব কথা শুনে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পড়ার সুযোগ করে দেন। আর আমার বাকি দুই বন্ধুও ফ্রিতেই পড়েছে।

রুটিনের বাইরে রাতে বা ভোরে পড়তাম, তবে অনিয়মিত। আর জয়েন্টের সময় তো কোচিং বিভিন্ন সময় হত, তাই কোচিংয়ের ফাঁকে পড়তাম দিনের বেলা। রাত্রে নির্দিষ্ট সময় পড়া যেত।

- ছুটিতে বাড়ি গিয়ে পড়া হত?
- না, পড়া হত না। কারণ, মিশনে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে

মিশনটাই বাড়ি হয়ে যায়। আর বাড়ি হয় বেড়াতে যাওয়ার জায়গা। বেড়াতে গিয়ে কি পড়া হয়!

- জয়েন্টের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?
- আমি একটা নিজস্ব ভাবনা নিয়ে পড়তাম। শুধু MCQ প্র্যাকটিস করলে সব কমন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। নিয়ম করে দৈনিক সাত-আট ঘণ্টা পড়া দরকার।
- রানিং ইয়ারে তোমার নাকি অনেক পিছনের দিকে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল?
- হ্যাঁ, ১০৩০৪ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল। একবার পরীক্ষা দিয়ে এত পিছনের দিকে র‍্যাঙ্ক করলেও হতাশ হওয়ার যে কিছু নেই, তা আমার এই বছরের র‍্যাঙ্ক থেকে বোঝা যাচ্ছে।
- কোথায় ভর্তি হলে? কী বিষয় নিয়েছ?
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুরে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন নিয়ে ভর্তি হয়েছি।
- কীভাবে এগোতে চাইছ?
- শিবপুরে ভর্তি হওয়া মানে বি-টেক— এম-টেকটাও করার সুযোগ পাওয়া। এম-টেক শেষে চাকরির পাশাপাশি গবেষণা করারও ইচ্ছে আছে।
- মিশনে ভর্তি হওয়া, জয়েন্টে সাফল্য— এইসব একসঙ্গে মিলিয়ে যদি বলা হয়, একজনের কথা বলো, যাঁর ভূমিকা সব থেকে বেশি, তাহলে তাঁর নাম কী হবে?
- আমার মা।
- তোমার মতো পরিবারের ছেলেমেয়েদের সফল হওয়ার জন্য কী পরামর্শ দেবে?
- শুধু নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য ভেবে এগোলে জায়গাটা ছোটো হয়ে যাবে। মানুষের কথা ভেবে, বড়ো লক্ষ্য নিয়ে, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবে। পরিকল্পনা করে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

সেরার পরামর্শ

তারিক আহমেদ

● প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ● একজন বিজ্ঞানী বলেছেন "ভালো ছাত্র সেই, যে এক ঘণ্টা পড়ে আর চার ঘণ্টা চিন্তা করে।" সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয় পড়ার পর গভীরভাবে চিন্তা করবে। ● যে-বিষয় পড়বে, সেটা পরে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে। ● পড়ার স্টাইল কারো অনুকরণ না করে, নিজের যেভাবে পড়তে ভালো লাগে, সেভাবে পড়বে। ● গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্ডার লাইন করে রাখবে অথবা কোনো চিরকুটে টুকে রাখবে। ● নিয়ম বাঁধা না হলেও পড়াশোনা রেগুলার হতে হবে। ● স্যারদের কখনও অসম্মান করবে না। ● জয়েন্টে ভালো রেজাল্ট করার জন্য প্রত্যেক চ্যাপটারের জন্য কমপক্ষে একশোটি MCQ প্র্যাকটিস করবে। ● স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবে। ● সর্বোপরি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখবে। ■

আল-আমীন বার্তা

দেখে পড়ার ▮ পড়ে দেখার

আল-আমীন মিশন

একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্য আপনিও।

পরিবারের মুখপত্র

আল-আমীন বার্তা

নিজে পড়ুন। অন্যকে পড়ান

নারীশিক্ষার অগ্রপথিক ফজিলতুননেসা জোহার জন্ম আজ থেকে একশো দশ বছর আগে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু, আজও তিনি নবীন উদ্দীপনার মতো প্রাসঙ্গিক। তাঁর একটি লিখন পুনর্মুদ্রিত হল এখানে।

মুসলিম নারীর মুক্তি

ফজিলতুননেসা জোহা

সংগ্রহ ও ভূমিকা: হাবিব আর রহমান

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১) প্রথম মুসলমান ছাত্রী ফজিলতুননেসা (১৯০৫—১৯৭৬) যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি দুঃসাহসী। বলা চলে, কেবল মেধা ও সাহসের ওপর নির্ভর করে নিম্নবিত্ত পরিবারের এই মেয়েটি প্রবল প্রতিকূল সমাজ-পরিবেশের মধ্যেও জীবনের অনেক উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা ওয়াজেদ আলী খাঁ তেমন শিক্ষিত ছিলেন না, সামান্য বেতনে টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদারবাড়িতে নগণ্য চাকরি করতেন। কিন্তু ছিলেন প্রশস্তহৃদয় মানুষ। তাই নিজের এই মেধাবী মেয়েটির লেখাপড়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াননি, বরং উৎসাহ জুগিয়েছেন। ফজিলতুন প্রতিটি পরীক্ষায় উজ্জ্বল মেধার স্বাক্ষর রেখে বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বিএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান পেয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরের বছর রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যান। দেশে ফেরার পর ১৯৩৫ সালে বেথুন কলেজে তিনি গণিতের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

'মুসলিম নারীর মুক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাতে'র ভাদ্র ১৩৩৬ (সেপ্টেম্বর ১৯২৯) সংখ্যায়। এটি ছিল বিশেষ মহিলা সংখ্যা। নাসির উদ্দীন দাবি করেছেন, কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এটিই ছিল কোনো সাহিত্য পত্রিকার মহিলা সংখ্যা। সংখ্যাটিতে তিরাশি জন রমণীর হাফটোন ছবি ছাপা হয়েছিল আর্ট প্লেটে। ফজিলতুন তাঁদের একজন। এটিই তাঁর এখনও পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র ছবি।]

যাঁরা একটু চোখ খুলে দেখেছেন, তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন যে, এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান-জাতির সম্মুখে অনেকগুলো অসাধারণ সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধান করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে— নিজের বিচার ও বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ। এজন্য আমি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে যে-টুকু ভেবেছি, তাই প্রকাশ করছি। আমার কথায় যদি কারো মনে আঘাত লাগে, তবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন— কারণ আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

"মুসলিম নারীর মুক্তি"— এই "মুক্তি" শব্দটী বলতে এখানে আত্মার মুক্তিই বুঝায়। আত্মার মুক্তি অর্থে স্বাধীন ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সমাজের ও জগতের কাজে নিয়োজিত ক'রে নিজের বিচার ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে চালিত করাই বুঝায়। ধর্ম্মগ্রন্থ এবং সাধু-বাক্য প্রভৃতিকে আমি বিচার-বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক উপায় বলেই মনে করি। এগুলোর দ্বারা বিচার-বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে গেলে এদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহুকাল সুপ্ত মুসলিম নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তারা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে; এবং তাদের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষ ভাবে লজ্জিত হ'য়ে পড়ছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হ'য়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না। নারী এতকাল নিজেকে মোহ-আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে— কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী-প্রাণ সেই কুৎসিত বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন ক'রে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারী-মন আজ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র— শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নাই— আছে কেবল দারুণ একটা আত্ম-গ্লানি, মর্ম্মভেদী একটা অনুশোচনা, আর সর্ব্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। পাপীর অনুতাপই যেরূপ তার পাপকে আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ ও খাঁটি ক'রে তোলে, সেইরূপ নারীর এই আত্ম-গ্লানিই তাকে

মনুষ্য-পদ-বাচ্য ক'রে তুলবে। এর জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যিক শিক্ষা। শিক্ষা বলতে কেবল কয়েকটা ডিগ্রির ছাপ নয়, যে-শিক্ষা মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে, বিবেক-বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও সুচালিত করে, সেই শিক্ষা, যে-শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-সম্মান বজায় রাখবার উপযোগী শক্তি দেয়, সেই শিক্ষা! মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা— খুব বেশী হ'লে দুই-একটা বাংলা বই পড়া, একটু চিঠি-পত্র লেখা, আর অর্থ না বুঝে তোতা পাখীর মত আরবী পড়া। আরবী পড়া আমি নিষেধ করছিনে— তবে আমার মতে অন্যান্য ভাষার ন্যায় ধর্ম্মভাষাও মানে না বুঝে পড়লে কোনই ফল হয় না।

প্রাইমারী শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রী-সংখ্যা অ-মুসলিম ছাত্রী-সংখ্যার চেয়ে বেশী দেখা যায়, অথচ বলতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নাম-নিশানাও থাকে না। অনেকে হয়ত মনে করেন, মেয়েদের অত লেখা-পড়ার দরকার কি? কিন্তু আমার মনে হয়— অন্ততঃ কয়েক জায়গায় যা' দেখেছি— এই অল্প শিক্ষাটাই ভয়ঙ্করী হ'য়ে একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করে। একটু লেখা-পড়া জানে এই গুমরটি অনেক সময় অনেকের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। এজন্য বলতে চাই যে, প্রাইমারী শিক্ষা যথেষ্ট শিক্ষা ত নয়ই, বরং অনেক সময় কুফল প্রসব করে। তবে এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, শিক্ষার আরও বহুল প্রচার হ'লে তখন আর এ-অহমিকা ভাবটি আসতে পারবে না। এখন ছিটে-ফোঁটা দুই-চার জন মাত্র শিক্ষিতা, এজন্য তাঁরা অহঙ্কার প্রকাশ করবার স্থান পাচ্ছেন। যখন সকলেই শিক্ষিতা হবেন, তখন আপনা-আপনি এ-বিদ্যার গুমর কেটে যাবে।

মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে না পারলে, এ-সমাজের উন্নতি কোন জন্মেও হবে না। তাই পুরুষের উপর সব কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে ব'সে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নিজেকে মানুষ ব'লে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হবে। ভিক্ষুকের মত কেঁদে, পায়ে ধ'রে চেয়ে, প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মত নিজের ন্যায্য অধিকার জোর ক'রে আদায় ক'রে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই— কিন্তু সে-শিক্ষা অর্জ্জন করতে হবে।

মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে না পারলে, এ-সমাজের উন্নতি কোন জন্মেও হবে না। তাই পুরুষের উপর সব কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে ব'সে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে।

যে কারা-শৃঙ্খল মুসলমান নারীর পায়ে পরিয়ে তাকে আজ সমস্ত সভ্য জগতের নারীর সামনে দীনা হীনা ক'রে রাখা হয়েছে, সে-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে হবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে। হয়ত তার পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হবে, তবু অপমানের হাত থেকে— লজ্জার হাত থেকে নারী মুক্ত হবে, এই তার জয়-গর্ব্ব। কারা-শৃঙ্খল যে কেবল নারীকেই তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, তা নয়; সমস্ত মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নারীর উপর সমাজের উন্নতি কতখানি নির্ভর করে, তা বোধ হয় অনেকেই বুঝতে পারেন। তবু যারা সে-উপকার বুঝেও বুঝতে চায় না— নারীর সেই ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চায় না, নারীর উচিত, সে-স্থলে তাদের দেওয়া সম্মান ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা— কারণ তারা প্রকৃত সম্মান করতে জানে না, সম্মানের অভিনয় করে মাত্র।

আমার মনে হয়, যে বন্দীখানায় মেয়েদিগকে জগতের আলো বাতাসের সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত ক'রে রুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে— যা মুসলিম নারীর মনের দ্বারে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেটা একবার পুরুষের উপর চাপিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। সংসারে যত কিছু অত্যাচার ও পাপ কাজ হচ্ছে, তার জন্য শুধু নারীই দায়ী— সে-কথা বোধ হয় কেউ বলবেন না। তবে কোন্ কারণে নারী বন্দিনী হ'য়ে থাকবে? থাকলে নারীরও থাকতে হবে, পুরুষেরও থাকতে হবে; নয়ত সকলেরই সমানভাবে জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার অধিকার ও দাবী আছে।

সতীত্ব যে নারীর একটা মহামূল্য সম্পদ, তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সমস্ত দরজা জানালায় খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ভিতরে অসূর্য্যম্পশ্যা হ'য়ে যে-নারী সকলের কাছে সতী ব'লে পরিচিত হয়, তার সে-নামের মূল্য কি? জগতের বাধা বিপদ অতিক্রম ক'রে, নানা প্রলোভনের ভিতর থেকেও যে-নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সেই ত প্রকৃত সতী। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখবার অধিকার দেওয়া হয় নাই; বরং তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দেবার কথা আছে; তার নিজের কর্ম্মফলে তাকেই ভুগতে হবে— এ-কথাও আছে। তাই যদি হয়, তবে নারীরও ত সুশিক্ষিতা হয়ে তার অধিকার বুঝে নেওয়ার এবং ভালমন্দ বিচার ক'রে তদনুসারে চলবার স্বাধীনতা আদায় ক'রে নেওয়া উচিত।

আজকাল স্কুল কলেজে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, সেইটেই যে আদর্শ শিক্ষা তা নয়। তবে ঘরে বসে অন্ধের মতো অন্যের দেখান পথে চলার চেয়ে এ-শিক্ষাতে যতটুকু উপকার হবে সেটুকুও মন্দের ভাল। শিক্ষা-সমস্যা একটা মস্ত বড় জটিল ব্যাপার। শিক্ষা-পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সে-সব ছেড়ে দিয়ে আমি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার বিষয় যা ভেবেছি— অন্ততঃ আমার স্থূল বুদ্ধিতে যা মনে হয়, তা এইরূপ:

অন্যান্য নারীদের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে প'ড়ে আছি। যারা প্রথম অগ্রসর হবে, তাদের হয়ত অনেকেরই কল্পিত স্বর্গের আশাটি ছেড়ে অগ্রসর হ'তে হবে। পৃথিবীতে যখন আমরা রয়েছি, তখন একেবারে জড়ের মতন না থেকে, একটু বোধ-শক্তি বিশিষ্ট হ'য়ে সকলের সঙ্গে সমান তালে চলাই বাঞ্ছনীয়। সমাজকে উন্নত ও সুসভ্য ক'রে তুলতে হ'লে প্রথমেই দরকার— নারী-শিক্ষা। আমার মনে হয়, দিনের পর দিন কেবল রাশি রাশি বই লিখলে, আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বক্তৃতা ছাড়লেও কিছু হবে না। সত্যিকার কাজ করতে হবে। মুসলিম মেয়েকে শিক্ষিতা হ'তে হবে। উচ্চ-শিক্ষা সকলের পক্ষে— বিশেষ ক'রে গরীবদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যে-মেয়েদের পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, সে-সব মেয়েরা যদি সমাজের জন্য, নারী জাতির জন্য একটু চেষ্টা করেন, তবেই কিছু করতে পারেন। এমনি ক'রে একটি ছোট দল গঠিত হ'লে পরে, তার থেকে মস্ত বড় জিনিষ গ'ড়ে উঠতে পারবে। একদিনের চেষ্টায় ইডেন স্কুল, বেথুন কলেজ, এ-সব তৈয়ার হয়নি। প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষয়িত্রী নিয়ে যা আরম্ভ হয়েছিল, কালক্রমে তা এত বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মুসলিম মেয়েরাও যদি কয়েকজন এমনি ক'রে তৈয়ার হ'তে পারেন, তবে তাঁরাও কালে দু-চারটি স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেদের ধর্ম্মের আদর্শ-অনুযায়ী মেয়েদের গ'ড়ে তুলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বেথুন স্কুলের মত তাঁদেরও হয়ত এমন একটা স্কুল হ'তে পারবে, যেখানে ইচ্ছা করলে তাঁরাও অন্ততঃ অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্যেও বলতে পারবেন, "এ-স্কুলে অ-মুসলিম মেয়েদের নেওয়া হবে না।" এমনি ক'রে কাজে লাগতে পারলে হয়ত ভবিষ্যতে মুসলিম নারীর মুক্তি হ'তে পারে, নতুবা চিরবন্ধনে চির-অন্ধকারে ডুবে থাকতে হবে আমাদেরকে।

মুসলিম তরুণ ভাইদের কাছে তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে, তাঁরা যদি এ-বিষয়ে তাঁদের বোনদের এগিয়ে আনেন, তবেই মুক্তির আশা। নতুবা শুধু বোনেরাই একলা ধ্বংস হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও মনুষ্যত্ব লুপ্ত হবে। কাজেই তাঁদের কাছে মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা প্রার্থনা করছি। ■

সাফল্যের মণিকুট্টিম ঘরে প্রবেশের হাজার দরজা। ঢুকে পড়ুন যেকোনো দোর খুলে। এখানে নামার কোনো সিঁড়ি নেই, শুধু উঠে যেতে হবে। দেশে আর বিদেশে শিক্ষার নানা ক্ষেত্রের সুলুকসন্ধান রয়েছে এই বিভাগে।

অন্য আরও পঠনপাঠন

মহম্মদ মহসীন আলি

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (NDA)

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (NDA) ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সেসের একটি জয়েন্ট সার্ভিস অ্যাকাডেমি। NDA বিশ্বের সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট ত্রিস্তরীয় সার্ভিস অ্যাকাডেমি। এখানে সামরিক শিক্ষানবিশের তিনটি বিভাগ হল— ক. দ্য আর্মি, খ. দ্য নেভি এবং গ. দ্য এয়ারফোর্স। এই তিনটি বিভাগের জন্য বাছাইকৃত ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নিজ-নিজ সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে পাঠানো হয়। ক. আর্মি ক্যাডেটদের পাঠানো হয় IMA, Dehradun, খ. এয়ারফোর্স ক্যাডেটদের পাঠানো হয় AFA, Dundigal, Hyderabad এবং গ. নাভাল ক্যাডেটদের পাঠানো হয় INA, Ezhimala, Kerala। এই ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির বাছাই পরীক্ষাটি ইউনিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC), নিউ দিল্লির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ-বছরের জন্য অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ এবং পরীক্ষার তারিখ হল ১৯ এপ্রিল ২০১৫।

যোগ্যতা: ক. ভারতীয় নাগরিক হলে এই পরীক্ষায় বসতে পারবে। খ. সাবজেক্ট অফ ভুটান। গ. সাবজেক্ট অফ নেপাল। ঘ. তিব্বতীয় রিফিউজি, যাঁরা ১ জানুয়ারি ১৯৬২ সালের আগে ভারতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আসেন। ঙ. পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব আফ্রিকার দেশ, যেমন— তানজানিয়া, জাম্বিয়া, মানাবি, জায়ির, ইথিয়োপিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকে ভারতবর্ষে বসবাসের উদ্দেশ্যে আগতরা।

● খ, গ, ঘ এবং ঙ বিভাগের প্রার্থীদের ভারত সরকারের কাছ থেকে যোগ্যতার শংসাপত্র নিয়ে জমা দিতে হবে। অবশ্য সাবজেক্ট অফ নেপাল গোর্খা প্রার্থীদের এরকম কোনো প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ● আর্মি শাখার জন্য স্টেট এডুকেশন বোর্ড থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (10+2) বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ● এয়ারফোর্স এবং নাভাল শাখার জন্য স্টেট এডুকেশন বোর্ড থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (10+2) বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা এবং গণিতকে প্রধান বিষয় রেখে উত্তীর্ণ হতে হবে। ● (10+2) পদ্ধতিতে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারে।

শংসাপত্র পাঠানোর ঠিকানা: নাভাল অ্যাকাডেমি প্রার্থীদের জন্য— Naval Headquarters, DMPR, OI & R Section, Room No. 204, C.wing, Sena Bhawan, New Delhi 110 011. **অন্যান্য প্রার্থীদের জন্য**— Directorate General Recruting, Army HQ, West Block-III, R K Puram, New Delhi 110 066.

বয়স, লিঙ্গ এবং বৈবাহিক অবস্থা: জন্মতারিখ ২ জুলাই ১৯৯৬-এর আগে নয় এবং ১ জুলাই ১৯৯৯-এর পরে নয় এমন অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীরাই কেবল আবেদন করতে পারবে। উক্ত জন্মতারিখ সাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে।

শারীরিক অবস্থা: উচ্চতা— সর্বনিম্ন ১৫৭.৫ সেন্টিমিটার। এয়ারফোর্সের জন্য সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৬২.৫ সেন্টিমিটার। **উচ্চতায় ছাড়**— ◗ উত্তরপূর্ব ভারতে বসবাসকারী, পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী, গাড়োয়াল এবং কুমায়ুনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন উচ্চতায় ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। ◗ লাক্ষাদ্বীপের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন উচ্চতায় ২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। ◗ যদি কোনো প্রার্থীকে মেডিকেল বোর্ড এই মর্মে শংসাপত্র দেয়

যে, প্রার্থী বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক উচ্চতা ধারণ করবে, তাহলে এ-ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন উচ্চতায় ২.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। ◗ এয়ারফোর্সের পাইলট প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক মাপ নিম্নরূপ:

Category	Minimum	Maximum
Leg Lenghth	99 cm	120 cm
Thigh Length	------	64 cm
Sitting Height	81.5 cm	96 cm

ছাতি: পুরো শ্বাস নিয়ে ছাতি ফুলিয়ে মাপ সর্বনিম্ন ৮১ সেন্টিমিটার এবং ছাতির প্রসারণ ক্ষমতা কমপক্ষে ৫ সেন্টিমিটার হতে হবে।

চোখের অবস্থা: নাভাল ছাত্রদের জন্য— ◗ Uncorrected without Glasses: 6/6 & 6/9 ◗ Corrected with Glasses: 6/6 & 6/6 ◗ Limits of Myopia: +1.5 ◗ Binocular Vision: III ◗ Limits Color Pereception: I. **এয়ার ফোর্স প্রার্থীদের জন্য—** ◗ Minimum Distant Vision: 6/6 in one eye and 6/9 in other. Correctionable to 6/6 only for typermetropia. ◗ Color Vision CP-I-Hypermetropia: +2.0 D sph. ◗ Manifest Myopia: Nil ◗ Retinoscopic Myopia: -0.5 in any Meridian permitted. ◗ Astigmatism: +0.75 D cyl. ◗ Maddox Rod Test.

শারীরিক অবস্থা: সমস্ত ইচ্ছুক প্রার্থীকে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সক্ষম হতে হবে। ◗ রান: ১৫ মিনিটে কমপক্ষে ২.৪ কিলোমিটার। ◗ স্কিপিং । ◗ পুস আপ এবং সিট আপ: প্রতিটি কমপক্ষে টানা ২০ বার। ◗ চিন আপ: অন্তত টানা ৮ বার। ◗ রোপ ক্লাইম্বিং: ৩ থেকে ৪ মিটার।

আবেদন-পদ্ধতি: যোগ্য প্রার্থীরা কেবল অনলাইনেই আবেদন করতে পারবে। এ-বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ জানুয়ারি ২০১৫। আবেদনের ফি বাবদ জেনারেল এবং ওবিসি প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। SC/ST/Son of JCO/NCO/ Other Rank Officers এবং সৈনিক/মিলিটারি স্কুলের ছাত্রদের কোনো ফিজ জমা দিতে হবে না। আবেদনের ফি বাবদ টাকা ভিসা/মাস্টার কার্ড/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেওয়া যায়। এ ছাড়া সরাসরি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানির অ্যান্ড জয়পুর/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ/ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মাইসোর/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রাবাঙ্কুরের মাধ্যমেও জমা দেওয়া যায়।

বাছাই-পদ্ধতি: স্টেজ ১— প্রাথমিক এই স্টেজে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রশ্ন থাকে অবজেক্টিভ টাইপ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কস থাকে। পরীক্ষা হয় ৫ ঘণ্টা ধরে। পরীক্ষা হলে ক্যালকুলেটার বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ। পরীক্ষার বিষয় এবং নম্বর নিম্নরূপ:

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2.5 hrs.	300
General Ability	02	2.5 hrs.	600
Total		**5 hrs.**	**900**

স্টেজ ২— সার্ভিস সিলেকশান বোর্ড (SSB) স্টেজ ১ থেকে বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ করে। ২০১৫ সালের জন্য SSB ইন্টারভিউয়ের

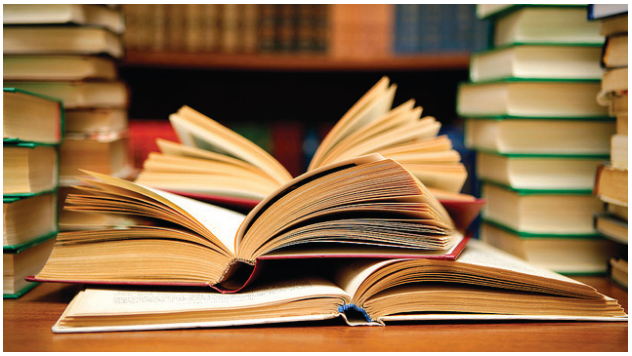

তারিখ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫-র মধ্যে। SSB ইন্টারভিউ হয় ৯০০ নম্বরের। **স্টেজ ৩—** ইন্টেলিজেন্স এবং পার্সোনালিটি টেস্ট— সার্ভিস সিলেকশান বোর্ডের বাছাইকৃত প্রার্থীদের এই বিভাগে প্রতিযোগিতা করতে হয়। আর্মি এবং নেভি শাখার প্রার্থীদের নেতৃত্ব-ক্ষমতার মূল্যায়ন করা হয় এখানে। এয়ারফোর্স শাখার প্রার্থীদের পাইলট অ্যাপটিচিউড টেস্ট এবং অফিসার পোটেনশিয়ালিটি মূল্যায়ন করা হয়। এই বিভাগেও দুটি স্তর থাকে। প্রাথমিক স্তরে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপটিচিউড টেস্ট (PAT) এবং ইন্টেলিজেন্স পরীক্ষা করা হয়। প্রথম স্তরে বাছাই করা প্রার্থীদের দ্বিতীয় স্তরের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে হয়। বাকিদের বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

যোগাযোগ: National Defence Academy (NDA) Khadakwasala, Pune 411 023, Maharastra, India. Ph.: 020-25290990, 25206880, Website: www.upsc.gov.in

হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোসাল সায়েন্স এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (HSEE) ফর আইআইটি মাদ্রাজ

HSEE হল আইআইটি মাদ্রাজে পাঁচ বছর ইন্টিগ্রেটেড কোর্সে ভর্তির একটি পরীক্ষা। প্রথম দু-বছর পঠনপাঠন একই হয়। পরের তিন বছর ছাত্রছাত্রীদের পছন্দমতো ইন্টিগ্রেটেড এমএ ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং ইন্টিগ্রেটেড এমএ ইন ইংলিশ স্টাডিজে বিভক্ত। এই কোর্সে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ২৬ জানুয়ারি ২০১৫। বাছাই পরীক্ষা নেওয়া হবে ২০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে।

যোগ্যতা: ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত কোর্স বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে— ◗ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় বোর্ডের অনুমোদিত 10+2 পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীরা। ◗ অনুমোদিত বোর্ড দু-বছর প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বা উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা। ◗ NDA-এর জয়েন্ট সার্ভিস উইংয়ের দু-বছর কোর্স করছে, এমন ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা। ◗ অ্যাডভান্সড লেভেল জেনারেল সার্টিফিকেট এডুকেশন (GCE) পরীক্ষা (লন্ডন/কেম্ব্রিজ/শ্রীলঙ্কা)-র ছাত্রছাত্রীরা। ◗ কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির হাইস্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনের ছাত্রছাত্রীরা। ◗ ভারতবর্ষের যেকোনো পাবলিক স্কুল/বোর্ড অথবা বিদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে 10+2 উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা। এ-ক্ষেত্রে কোর্সটি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।

◗ হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স অফ ভোকেশনাল এগজামিনেশন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা। ◗ ন্যাশনাল ওপেন স্কুল পরিচালিত সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল এগজামিনেশন (যেখানে অন্তত পাঁচটি বিষয় থাকতে হবে)-এর ছাত্রছাত্রীরা।

বয়স: ছাত্রছাত্রীর জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৯০ বা তার পরে হতে হবে। SC/ST/PD বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৮৫ বা তার পরে হলেও চলবে।

আবেদন-পদ্ধতি: কেবল অনলাইন পদ্ধতিতেই আবেদন করা সম্ভব। SC/ST/PD/Female ছাত্রছাত্রীদের ফি বাবদ জমা করতে হবে ৮০০ টাকা এবং জেনারেল/ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জমা করতে হবে ১৬০০ টাকা। আবেদনের ফি বাবদ টাকা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে বা নেট ব্যাঙ্কিং/ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও জমা দেওয়া যাবে। আবেদনের সময় অনলাইনে আপলোড করতে হবে ছাত্রছাত্রীর স্ক্যান করা ছবি, পুরো সই, বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে ক্লাস টেনের সার্টিফিকেট, 10+2-এর মার্কশিট (10+2 উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে), SC/ST/PD/OBC/Non Creamy Layer-এর শংসাপত্রও স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। আনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনপত্রের ডাউনলোড করা কপি এবং তার সাথে উক্ত নথিপত্র স্পিড পোস্টের মাধ্যমে বিভাগীয় ঠিকানায় পাঠাতে হবে। পাঠানোর ঠিকানা: The Chairman, HSEE 2015, JEE Office, IIT Madras, Chennai 600 036।

পরীক্ষা-পদ্ধতি: সঠিকভাবে আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীরা ১৬ মার্চ ২০১৫ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে পরীক্ষার প্রবেশিকাপত্র ডাউনলোড করতে পারবে। ভারতবর্ষের প্রধান শহরগুলির মতো কলকাতাতেও এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুটি বিভাগ মিলিয়ে এই পরীক্ষার সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। প্রথম ভাগে ২.৫ ঘণ্টায় থাকে ইংরেজি এবং কম্প্রিহেনশন স্কিল, অ্যানালিটিক্যাল এবং কোয়ান্টিটেটিভ স্কিল, জেনারেল স্টাডিজ— ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স (সায়েন্স ইন্ডিপেনডেন্স), ইন্ডিয়ান সোসাইটি, কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী), এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজি। দ্বিতীয় ভাগে ৩০ মিনিটে থাকে প্রবন্ধ রচনা।

যোগাযোগ: The Chairman, HSEE 2015, JEE Office, IIT Madras, Chennai 600 036. Ph.: 044-2257 8220, Fax: 044-2257 8224, e-mail: hsee@iitm.ac.in, Website: http://hsee.iitm.ac.in

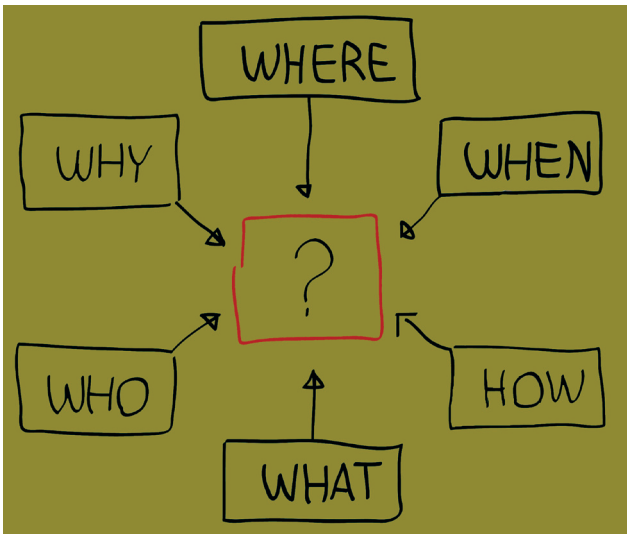

সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম অফ ন্যাশনাল ওভারসিজ মাস্টার ডিগ্রি অ্যান্ড পিএইচডি ফর ওবিসি স্টুডেন্টস

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ সোসাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের দেশের বাইরে মাস্টার ডিগ্রি এবং পিএইচডি করার জন্য স্কলারশিপ প্রদান করে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এবং মেডিকেল সায়েন্স বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরই কেবল এই সুযোগ দেওয়া হয়। এই কোর্সে ছাত্রীদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকে।

যোগ্যতা: ১. পিএইচডি-র জন্য আবেদনকারীকে মাস্টার ডিগ্রিতে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হতে হবে। ২. মাস্টার ডিগ্রির জন্য আবেদনকারীকে গ্র্যাজুয়েশানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৩. আবেদনকারীকে ভারতবর্ষের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। ৪. আবেদনকারীর বয়স আবেদন করার সময় পর্যন্ত ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। ৫. আবেদনকারীকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অনুমোদিত ওবিসি সাব-কাস্টগুলির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রকৃত ওবিসি শংসাপত্র জোগাড় করতে হবে। ৬. পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।

শর্তাবলি: ১. নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীকে এক বছরের মধ্যেই নির্দিষ্ট বিষয়ে ভর্তি হতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। ২. পিএইচডি-র জন্য এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে ৪ বছর। ৩. মাস্টার ডিগ্রির জন্য দেওয়া হবে ৩ বছর। ৪. USA (United States of America)-তে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের খোরপোশ বাবদ বছরে ১৫৪০০ ডলার পর্যন্ত প্রদান করা হয়। বইপত্র, গবেষণার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং স্টাডি ট্যুরের জন্য দেওয়া হয় প্রায় ১৫০০ ডলার। টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বাবদ দেওয়া হয় প্রায় ২৪০০ ডলার। টুকটাক রাস্তাখরচ বাবদ প্রায় ২০ ডলার। অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনা বাবদ আরও ২০ ডলার। এ ছাড়া পোল ট্যাক্স, ভিসা ফিজ, মেডিকেল ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম, ইকোনোমিক ক্লাসে যাওয়া-আসার প্লেনভাড়াও প্রদান করা হয়। ৫. UK (United Kingdom)-তে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের খোরপোশ বাবদ বছরে প্রায় ৯৯০০ পাউন্ড দেওয়া হয়। বইপত্র, গবেষণার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং স্টাডি টুরের জন্য দেওয়া হয় প্রায় ১১০০ পাউন্ড। টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বাবদ দেওয়া হয় প্রায় ১৫৬০ পাউন্ড। টুকটাক রাস্তাখরচ বাবদ প্রায় ২০ ডলার। অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাবদ আরও প্রায় ২০ ডলার। এ ছাড়া পোল ট্যাক্স, ভিসা ফিজ, মেডিকেল ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম, ইকোনোমিক ক্লাসের যাওয়া-আসার প্লেনভাড়াও প্রদান করা হয়। ৬. কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে দেশে ফিরতে হয়। অবশ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে লিখিতভাবে অনুমতি চাইলে কোর্স শেষ হওয়ার পরে আরও এক বছর থাকার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোনোরকম আর্থিক সহায়তা করবে না। ৭. চাকরিরত কেউ আবেদন করতে চাইলে, বর্তমান চাকরির নিয়োগকর্তার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ৮. চাকরিরত

কেউ আবেদন করতে চাইলে, তাঁকে কর্তৃপক্ষের NOC নিয়ে, তা আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। ৯. আবেদনকারীর শেষ মাসের স্যালারি স্লিপ এবং শেষ ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্টের কপি জমা দিতে হয়। ১০. একটি পরিবারের কেবল একজন সদস্যকেই এই সুযোগ দেওয়া হয়।

যোগাযোগ: Director (BC), Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, 9th Floor, Jeevan Prakash Building, 25 K G Marg, New Delhi 110 001.

আইএমইউ (IMU) সিইটি (CET) 2015

ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি স্বীকৃত বিভিন্ন কলেজে ভর্তির এটি একটি কমন এন্ট্রান্স টেস্ট। সারা ভারতের বিভিন্ন শহরে এই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস রয়েছে। যেমন— চেন্নাই, কারাইকাল, কোচি, কান্ডালা, কলকাতা (মেরি কলকাতা), মুম্বাই (মেরি মুম্বাই) এবং বিশাখাপত্তনাম। IMU CET 2015-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত শাখায় ভর্তি হওয়া সম্ভব: ১. বি-টেক (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং)— ৪ বছর। ২. বি-টেক (নাভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড ওশান ইঞ্জিনিয়ারিং) — ৪ বছর। ৩. বিএসসি (ন্যাটিক্যাল সায়েন্স)— ৩ বছর। ৪. বিএসসি (শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড রিপেয়ার)— ৩ বছর। ৫. ডিপ্লোমা ইন ন্যাটিক্যাল সায়েন্স লিডিং টু বিএসসি ন্যাটিক্যাল সায়েন্স। এ ছাড়া এমবিএ, এলএলএম বা এম-টেকে ভর্তি হওয়াও সম্ভব। অবশ্য এইসব স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তির আলাদা পরীক্ষা দিতে হয়।

যোগ্যতা: প্রথম প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে। এ ছাড়া ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ৩১ মে ২০১৫ তারিখের আগে কোনো ছাত্রছাত্রী দ্বাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিলে, তারাও IMU CET 2015– প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিবাহিত কোনো প্রার্থী এই প্রাতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বিভিন্ন শাখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দ্বাদশ শ্রেণিতে নূন্যতম দরকারি বিষয়ভিত্তিক নম্বর:

Course	Minimum % Marks in Phy., Chem & Math.	Minimum % Marks in English
DNS Leading to BSc NS	60	50
BSc Nautical Science	60	50
B. Tech. Marine Engg.	60	50
BSc Ship Building & Repair	50	60

বয়স: ছাত্রছাত্রীর জন্মতারিখ ১ আগস্ট ১৯৮৫ বা তার পরে হতে হবে।

ভিশান: **বিএসসি ন্যাটিক্যাল সায়েন্স এবং বিএসসি মেরিটাইম সায়েন্স কোর্সের জন্য—** ◗ প্রার্থীর দুই চোখেই ভিশান থাকবে ৬/৬। ◗ প্রার্থীর চোখে চশমা থাকলে উক্ত বিভাগে আবেদন করতে পারবে না। **বি-টেক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য—** ◗ প্রার্থীর চোখের পাওয়ার স্বাভাবিক বা প্রতি চোখে প্লাস/মাইনাস ২.৫-এর মতো হতে হবে। ◗ নির্দিষ্ট পাওয়ারের চশমা পরার অনুমতি আছে।

আবেদন-পদ্ধতি: শুধুমাত্র অনলাইনেই এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করা সম্ভব। সাধারণত এপ্রিল মাসে আবেদন করতে হয়। প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হয় জুন মাসে।

ফিজ: আবেদনের ফি বাবদ টাকা চালান ডাউনলোড করে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে চালানের মাধ্যমে জমা করা যায়। এ ছাড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনলাইন ব্যাঙ্কিং বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও জমা দেওয়া যেতে পারে। জেনারেল ক্যাটাগরি প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১০০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি লাগে ৭০০ টাকা। অনলাইনে সম্পূর্ণরূপে আবেদন করা হয়ে গেলে পূরণ করা আবেদনপত্রের একটি প্রিন্ট-আউট নিয়ে ফি জমা দেওয়ার চালান এবং নথিপত্র বিভাগীয় ঠিকানায় পাঠাতে হয়। ঠিকানা: Admission Cell, Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai 600 119.

পরীক্ষা-পদ্ধতি: IMU CET 2015 প্রতিযোগিতার সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। প্রশ্ন হয় মাল্টিপল চয়েস টাইপের। ৪-টি অপশনের মধ্যে সঠিক একটিকে চয়েস করতে হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়ভিত্তিক নম্বর নিম্নরূপ:

বিষয়	নম্বর
পদার্থবিদ্যা	৫০
গণিত	৫০
রসায়ন	২৫
ইংরেজি	২৫
সাধারণ জ্ঞান	২৫
সাধারণ অ্যাপটিচিউড	২৫
সর্বমোট	২০০

সংরক্ষণ: মোট আসনের সংরক্ষণ পদ্ধতি: এসটি ৭.৫ শতাংশ, এসসি ১৫ শতাংশ, ওবিসি (নন-ক্রিমিলেয়ার) ২৭ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ৩ শতাংশ।

যোগাযোগ: Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai 600 119. Ph.: +91 44-24530343/345, VC's Office Fax: +91 44-2453 0335, Registrar's Office Fax: +91 44-2453 1084, website: imu.edu.in

U-LSAT 2015: UPES(University of Petroleum and Energy Studies) Law Studies Aptitude Test

ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এনার্জি স্টাডিজ (UPES) দেরাদুনে অবস্থিত একটি ডিমড্ ইউনিভার্সিটি। ল কোর্সের বিভিন্ন শাখায় ভর্তির জন্য UPES ইউনিভার্সিটি U-LSAT 2015 প্রতিযোগিতা পরীক্ষা পরিচালনা করছে। বিভিন্ন কোর্স এবং সময়সীমা নিম্নরূপ:

Course	Duration
BA LLB(Hons) with emphasis on Energy laws	5 Years
BBA LLB(Hons) with emphasis on Corporate laws	5 Years
BCom LLB(Hons) with emphasis on Taxation laws	5 Years

এ ছাড়া নিম্নলিখিত কোর্সগুলির UPES-ই ভারতবর্ষে প্রথম ল স্কুল যেখানে UPES EAT প্রতিযোগিতা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া সম্ভব।

Course	Duration
B.Tech.–Energy Technology +LLB(Hons) Specialization in Intellectual Property Rights (IPR)	6 Years
B.Tech.–Computer Science Engineering+LLB(Hons) Specialization in Cyber Law	6 Years

যোগ্যতা: মোট আসনের ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী (U-LSAT 2015) প্রতিযোগিতা পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়। বাকি ২০ শতাংশ নেওয়া হয় CLAT (Common Law Admission Test) 2015 মেরিট/ LSAT(Law School Admission Test) 2015 মেরিট/বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে।

বয়স: যেসব ছাত্রছাত্রীর জন্মতারিখ ১ অক্টোবর ১৯৯৩ বা তার পরে, কেবল তারাই এইসব কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। ◗ BA, LLB(Hons)/ BBA, LLB(Hons)/BCom, LLB(Hons)– এই কোর্সগুলিতে ভর্তির পরীক্ষার (U-LSAT 2015) আবেদনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দশম এবং দ্বাদশ অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

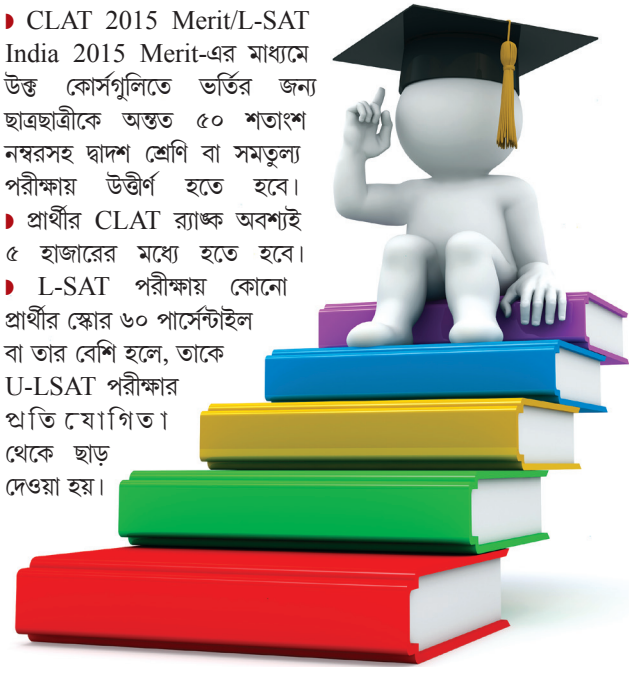

◗ CLAT 2015 Merit/L-SAT India 2015 Merit-এর মাধ্যমে উক্ত কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীকে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ দ্বাদশ শ্রেণি বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ◗ প্রার্থীর CLAT র‍্যাঙ্ক অবশ্যই ৫ হাজারের মধ্যে হতে হবে। ◗ L-SAT পরীক্ষায় কোনো প্রার্থীর স্কোর ৬০ পার্সেন্টাইল বা তার বেশি হলে, তাকে U-LSAT পরীক্ষার প্রতিযোগিতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়।

এ-ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সরাসরি গ্রুপ ডিশকাসন (GD) এবং ইন্টারভিউয়ে সুযোগ দেওয়া হয়। ◗ U-LSAT প্রতিযোগিতা ছাড়া বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণি বা সমতুল্য শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় ইংরেজি আবশ্যিকসহ ৫-টি বিষয়ে অন্তত ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। এই প্রার্থীদের সরাসরি গ্রুপ ডিশকাসন (GD) এবং ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়।

আবেদন-পদ্ধতি: নিম্নলিখিত ৩ রকম পদ্ধতিতে আবেদন করা সম্ভব— ক. হাতে-হাতে— অ্যাডমিশন টেস্ট সেন্টার, যেমন— আমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, কোচিন, কোয়েম্বাটুর, দিল্লি, দেরাদুন, হায়দেরাবাদ, কলকাতা এবং মুম্বাই থেকে সরাসরি ফর্ম পাওয়া যায়। অথবা নির্দিষ্ট অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের শাখা থেকেও ফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এ-ক্ষেত্রে ফর্মের মূল্য দিতে হয় ১৭৫০ টাকা। খ. ডাকযোগে— বিভাগীয় কর্তাকে ফর্মের জন্য অনুরোধ করে

চিঠি লিখে সঙ্গে 'UPES Fee Amount' (Payable at New Delhi/ Dehradun) নামে একটি ১৮৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়েও ফর্ম পাওয়া সম্ভব। গ. অনলাইনে— একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আবেদনকারী নিজেকে রেজিস্টার করে বা ফেসবুকে লগ ইন করেও আবেদন করতে পারে। আবেদনের ফি ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেওয়া সম্ভব। এ ছাড়া 'UPES Fee Amount' (Payable at New Delhi/ Dehradun) নামে একটি ১৮৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমেও এই ফি দেওয়া সম্ভব। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ মে ২০১৫।

পরীক্ষা-পদ্ধতি: প্রশ্নপত্র থাকবে শুধুমাত্র ইংরেজিতে। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন এবং সময়সীমা থাকে নিম্নরূপ:

Sections	No. of Questions
Language Comprehension	30
Quantitative and Numerical Ability	30
Logical Reasoning	30
Legal General Knowledge	30
Legal Aptitude	30
Total No. of Questions	**150**

U-LSAT 2015 পরীক্ষার তারিখ ১১ মে ২০১৫ থেকে ১৭ মে ২০১৫।

যোগাযোগ: U-LSAT 2015, P.O.: Bidholi, Via: Prem Nagar, Dehradun 248007. Ph.: +91-135-2102691/692, 2776095/054, Fax: +91-135-2776095, e-mail: enrollments@upes.ac.in, website: www.upes.ac.in ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

প্রাচীনতম বাসস্থান

এমন কোনো বাড়ি কি আজও টিকে আছে, যেখানে বহু হাজার বছর আগেও মানুষ বসবাস করত? হ্যাঁ, আছে। সবচেয়ে পুরোনো বাসস্থানটি রয়েছে ফ্রান্সে, ব্রিটানি উপকূলে, বাহ্‌নিনেজ নামে একটি জায়গায়। জায়গাটি সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দিতে হলে আমাদের বলতেই হবে যে, এটি ব্রিটানির উত্তর ফিনিসতেয়ার কার্নিলেহন অন্তরীপে ফ্লুয়েজখ নামে একটি জায়গায়।

আকাশ থেকে তোলা দ্য কেয়ার্ন অফ বাহ্‌নিনেজের ছবি।

নিয়োলিথিক সভ্যতার, অর্থাৎ নবপলীয় সভ্যতার একেবারে শুরুর দিকে তৈরি এই সৌধটির রেডিয়ো-কার্বন পরীক্ষায় দুটি বয়স বের করা সম্ভব হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, প্রথম অংশটি তৈরি হয়েছিল ৪৮৫০ থেকে ৪২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এবং দ্বিতীয় অংশটি তৈরি হয় ৪৪৫০ থেকে ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এটিকে এখন বলা হয় 'দ্য কেয়ার্ন অফ বাহ্‌নিনেজ' (The Cairn of Barnenez), অর্থাৎ বাহ্‌নিনেজের শিলাস্তূপ। কেন শিলাস্তূপ?

বাহাত্তর মিটার লম্বা, পঁচিশ মিটার চওড়া আর আট মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এই স্তূপটি তৈরি হয়েছিল প্রায় পাথরের পর পাথর সাজিয়ে, যার ওজন তেরো হাজার থেকে চোদ্দো হাজার টন।

এটিকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম বিল্ডিং বা ভবন বা বাড়ি বলা হয়।

১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত ছিল ব্যক্তিমালিকানায়। ওই বছরই ফ্রান্স সরকার বাহ্‌নিনেজের শিলাস্তূপ অধিগ্রহণ করে। এবং পুরোদস্তুর রক্ষণাবেক্ষণও শুরু হয়।

কী রয়েছে বাহ্‌নিনেজের শিলাস্তূপে?

মোট এগারোটি কক্ষ রয়েছে এই স্তূপে এবং প্রত্যেকটি কক্ষে যাওয়ার জন্যে আলাদা আলাদা প্রবেশপথ। ছোটো-বড়ো পাথর কাদা দিয়ে গেঁথে এর দেওয়াল এবং ছাদ তৈরি হয়েছে, যা আদতে মেগালিথিক অর্থাৎ প্রস্তরযুগের চরিত্রের।

দ্য কেয়ার্ন অফ বাহ্‌নিনেজের সুড়ঙ্গদ্বার।

পুরো স্তূপটি দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। অনুমান করা হয়, প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে সামনের উর্বর কৃষিক্ষেত্র এবং সমুদ্রের মাছের ওপর, অর্থাৎ খাদ্যের প্রাচুর্যের ওপর আস্থা রেখেই মানুষ এখানে এত শ্রমমাধ্য একটি সৌধ নির্মাণ করেছিল বসবাসের জন্য। কিন্তু তখনও তারা আদিম যুগের গুহাবাসের কথা ভুলতে পারেনি। তাই যখন বসবাসের জন্যে বাড়ি তৈরি করল, সেটির আদলও আসলে সেই গুহার মতোই দাঁড়িয়ে গেল।

বসবাস যখন করত, যত আদিমই হোক, তাদের শিল্পীমনেরও কিছু পরিচয় তারা রেখে গেছে। পাথরের দেওয়ালে ছবি এঁকেছে। কিছু বাসনপত্রও তৈরি করেছে এবং সেই বাসনপত্রও চিত্রিত। আমরা বলতে পারি, সেইসব চিত্রিত বাসন-পেয়ালাই হয়তো-বা পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন। অন্তত একটির চিত্রণ আজও টিকে আছে আমাদের যুগ পর্যন্ত। ওই সৌধে পাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে বাহ্‌নিনেজের শিলাস্তূপের একটি কক্ষে ছোট্ট একটি জাদুঘরও তৈরি হয়েছে উৎসুক দর্শনার্থীদের জন্যে।

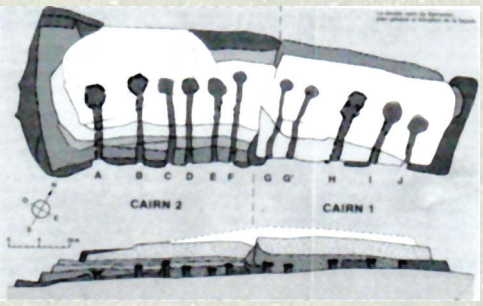

দ্য কেয়ার্ন অফ বাহ্‌নিনেজের নকশা।

যে-নবপলীয় সভ্যতায় শিকার থেকে কিছুটা সরে এসে কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ছিল মানুষ আর যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বাসস্থান তৈরিতে মনোযোগী হয়েছিল, সেই সভ্যতারই দান বাহ্‌নিনেজ স্তূপ।

জেব্রা

আলিপুর চিড়িয়াখানায় গেলেই আমরা ডোরাকাটা আর ঝকঝকে জেব্রাদের দেখা পাই। সবাই জানি, এই দৃষ্টিনন্দন স্তন্যপায়ী প্রাণীটির মাতৃভূমি আসলে আফ্রিকা। কিন্তু আমরা কি জানি, মানুষের অত্যাচারে পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হওয়ার দিন গুনছে জেব্রা?

এমন একটা সময় ছিল, যখন গোটা পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে জেব্রার দল ঘুরে বেড়াত মুক্ত চিত্তে আর তখন তাদের সংখ্যাও ছিল আনুমানিক সাড়ে সাত লক্ষ।

আর এখন?

সব প্রজাতির জেব্রা মিলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে বড়োজোর সাড়ে পাঁচ হাজার। হ্যাঁ, মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার! হয়তো-বা তারও কম।

কী করে কমল? তবে কি কমতে কমতে সত্যিই জেব্রারা হারিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে?

হ্যাঁ, তেমনই আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। কেননা, বুনো জন্তুর আর মানুষের আক্রমণে প্রতি বছর কমবেশি হাজার খানেক জেব্রা মারা পড়ে। আমরা যদি জেব্রা সংরক্ষণের সমস্তরকম চেষ্টা এবং উদ্যোগ না নিই, তাহলে বিলুপ্ত স্তন্যপায়ীদের তালিকায় শিগ্‌গির যুক্ত হবে আরও একটি প্রাণীর নাম।

এ পর্যন্ত শুধু আফ্রিকা মহাদেশ থেকেই নিশ্চিতভাবে বিলুপ্ত হয়েছে উনতিরিশটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। তালিকার শেষ নামটি উইমেরস স্রাউ। পশ্চিম আফ্রিকার এই প্রাণীটিকে এই সেদিন অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের পর আর কেউ চোখে দেখেনি। সম্ভাব্য বিলুপ্ত প্রাণীর তালিকায় রয়েছে আরও চারটি প্রাণী। হয়তো-বা তারা আর নেই। তবু, হাতেকলমে প্রমাণ না পেয়ে আমরা বলতে পারছি না যে, তারা বিলুপ্ত হয়েছে।

এ তো গেল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা। এ ছাড়া কত রকমের যে পাখি, সরীসৃপ, জলজ প্রাণী আর নানা প্রজাতির উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! যেমন ডোডো পাখি। বিলুপ্ত হয়েছে সেই কবে, ১৬৬২ সালে। চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে আমাদের উপকথায় স্থান পেয়েছে। যদি এখনই আমরা ব্যবস্থা না নিই, জেব্রাও একদিন টিকে থাকবে শুধু গল্প-কাহিনিতে। আর থাকবে ছবিতে। আর, শহরের রাস্তায়, জেব্রা-ক্রসিংয়ে!

কালো পিচরাস্তায় সাদা দাগ এঁকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় রাস্তা পারাপারের যে-জায়গাটি, তার নাম আমরা দিয়েছি জেব্রা-ক্রসিং। আমরা কি জানি, জেব্রার শরীরের চিত্রণও তেমনই? হ্যাঁ, ঠিক তাই। আগে প্রাণী-বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন, জেব্রার শরীর আসলে সাদা। তার ওপর কালো ডোরাকাটা। এখন বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, না, তা নয়। জেব্রার শরীরের মূল রংটি কালো। তার ওপর সাদা ডোরাকাটা। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি জেব্রার ডোরাকাটা চিত্র আলাদা। দুটো জেব্রার গায়ের নকশা কখনও এক হয় না।

জেব্রা শব্দটি এল কোত্থেকে? ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে এসেছে শব্দটি। হতেও পারে পর্তুগিজ ভাষা থেকে এসেছে। আর, পর্তুগিজরা পেয়েছে কঙ্গোলিজদের মুখের ভাষা থেকে।

সংকর জাতের এই প্রাণীটির উৎস ঘোড়া এবং গাধা, যদিও একে ঘোড়া-গোত্রের বলে গণ্য করা হয়। আনুমানিক চল্লিশ লাখ বছর ধরে বিবর্তনের সাক্ষী আজকের জেব্রা। এবং আজ তারা শেষ হতে চলেছে।

জেব্রা মূলত তিন জাতের। গ্রেভিস জেব্রা, মাউন্টেন জেব্রা আর প্লেন জেব্রা। এরা আবার মোট ন-টি শাখায় বিভক্ত।

কিন্তু এরাই সবচেয়ে দ্রুত কমে আসছে। কয়েক বছর আগেও ছিল পনেরো হাজার। এখন নেমে এসেছে মাত্র তিন হাজারে। আর রয়েছে কেপ মাউন্টেন জেব্রা ছয় থেকে সাতশো। হার্টস্যানস মাউন্টেন জেব্রা আটশো থেকে তেরোশো।

কী খায় এরা? মূলত তৃণভোজী। এদের প্রিয় খাদ্য সাভানা ঘাস। আর এদের কারা খায়? সিংহ, হায়েনা আর এইসব হিংস্র জন্তুর চেয়েও হিংস্র মানুষ। এদের শত্রু এদের চামড়াও। শুধু চামড়ার জন্যেই কত জেব্রাকে যে হত্যা করা হয়! একটা জেব্রা সাধারণত ছয় থেকে সাড়ে আট ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ওজন সাড়ে তিন কুইন্টলের মতো। লেজ প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা। গ্রেভিস জেব্রা মাউন্টেন জেব্রার থেকে শারীরিকভাবে একটু বড়ো।

হাজার বছর আগে এক বাঙালি কবি লিখেছিলেন: "অপণা মাসে হরিণা বৈরী"। নিজের মাংসের জন্যেই হরিণ সবার শত্রু। কবির সেই কথাটি আজও প্রাসঙ্গিক আমাদের দেশেরই গির অরণ্যের সিংহ, জলদাপাড়ার একশৃঙ্গ গণ্ডার, সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার ইত্যাদির মতো প্রাণীর ক্ষেত্রেও, যারা একদিন ছিল জঙ্গলের সম্রাট। কথাটি তেমনই প্রযোজ্য জেব্রার ক্ষেত্রেও। যদি আমরা সতর্ক না হই, নিজের মাংস আর চামড়ার জন্যেই বিলুপ্ত হতে পারে সুন্দর এই প্রাণীটি।

আবার তার সৌন্দর্য এবং সরলতার জন্যেই জেব্রা বরাবর আফ্রিকার নানা জাতির উপকথায় স্থান পেয়েছে। এমনকী, সম্রাট জাহাঙ্গিরের নির্দেশে মোঘল দরবারের বিখ্যাত চিত্রকর উস্তাদ মনসুরকে জেব্রার ছবিও আঁকতে হয়েছিল।

সেই জেব্রা কি সত্যিই ডাইনোসরদের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে!

জলপানরত জেব্রার দল।

ক্রিকেট

এখন চলছে ক্রিকেট উৎসব। বিশ্বকাপের ধুন্ধুমার লড়াই। রাত জেগে গোগ্রাসে গিলছি একেকটা ছক্কা, চার, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় নেওয়া ক্যাচ, অবিশ্বাস্য গতিতে ব্যাটসম্যানের দিকে ছুটে যাওয়া বাউন্সার। তবু বলব, একদিনের ক্রিকেট এখন ব্যাটসম্যানের খেলা। পঞ্চাশ ওভারে তিনশো রানের গণ্ডি পেরিয়ে যাচ্ছে যেকোনো দল। যত দিন যাচ্ছে, ব্যাটসম্যানের শরীরকে বলের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রযুক্তির ঢাল বেড়েই যাচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন শুধু দু-পায়ে প্যাড পরে চাঁদের মাটিতে হাঁটার মতো ব্যাটসম্যান নেমে পড়ত ব্যাট হাতে। প্রায় নিধিরাম সর্দার। দুনিয়ার সেরা প্লেয়ারের দল এটুকুই পেয়েছিল। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগের গাভাসকার পর্যন্ত। বড়োজোর তাঁরা কেউ কেউ আর্মগার্ড বা চেস্টগার্ড ব্যবহার করেছেন।

এখন দিন-রাত সারা বছর ক্রিকেট। কোটি কোটি টাকা উড়ছে ক্রিকেটে। চমকদার, আলো-ঝলমলে মাঠ। এগারো জন প্লেয়ারের জন্যে একটা জবরদস্ত সাপোর্টিং টিম। মাথার ওপর কোচ, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, বোলিংকোচ, প্লেয়ারদের শরীর তরতাজা রাখার জন্যে কোচ— কতরকম!

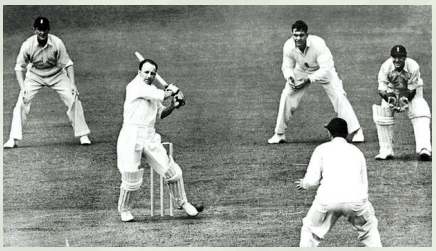

ব্যাটিংরত ক্রিকেটের কিংবদন্তি স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান।

এই খেলাটির উৎপত্তি হয়েছিল কী করে, কখন, কোন দেশে?

ক্রিকেটের জন্মের ইতিহাস নিখুঁতভাবে পাওয়া না গেলেও এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে খেলাটি এসেছে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে। বসতি তৈরির জন্যে জঙ্গল কেটে সাফ করবার সময় যে-প্রান্তর তৈরি হত, সেই ঘাসে ঢাকা মাঠে বাচ্চারা এটি খেলত। সপ্তদশ শতকের শুরুতে বড়োরা খেলাটি ছিনিয়ে নেয়। কেন্ট, সাসেক্স আর সারে— এই তিনটি কাউন্টির ছোটোরা নিজেদের মতো এটি খেলত। কিন্তু খেলাটি কত পুরোনো? একটি সাক্ষ্য থেকে হিসেব পাওয়া গেছে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় ক্রিকেট খেলা হত। সবচেয়ে পুরোনো নথিটি একটি আদালতের। সারে কাউন্টির গিলফোর্ড কোর্টে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি সোমবার জন ডেরিক নামের এক কর্নেল সাক্ষী দেন, যখন তিনি স্কুলছাত্র, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি মাঠে ক্রিকেট (creckett— এমনই বানান ছিল তখন) খেলতেন। এটিই ক্রিকেট সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরোনো নথি।

creckett-এর পূর্বরূপ ছিল ক্রেগ (creag)। সে ছিল ত্রয়োদশ শতকের শেষ এবং চতুর্দশ শতকের শুরুর কথা। ইংল্যান্ডেশ্বর তখন প্রথম এডওয়ার্ড। ১৬১১ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রামীণ ক্রিকেটের বিবর্তন ঘটে আমূল। ১৭৪৪-এ ক্রিকেটের প্রথম আইনটি স্থির হয় যে, ব্যাটসম্যান একই বল দু-বার আঘাত করতে পারবে না এবং করলে তাকে আউট বলে ঘোষণা করা হবে।

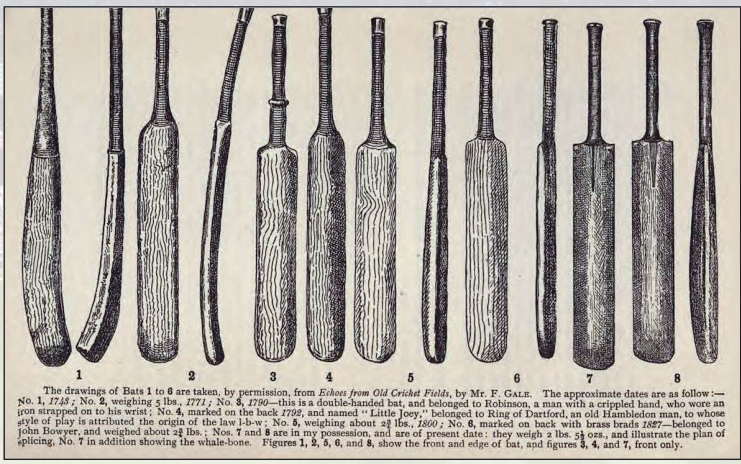

1 2 3 4 5 6 7 8

The drawings of Bats 1 to 6 are taken, by permission, from *Echoes from Old Cricket Fields*, by Mr. F. Gale. The approximate dates are as follow:— No. 1, *1745*; No. 2, weighing 5 lbs., *1771*; No. 3, *1790*—this is a double-handed bat, and belonged to Robinson, a man with a crippled hand, who wore an iron strapped on to his wrist; No. 4, marked on the back *1792*, and named "Little Joey," belonged to Ring of Dartford, an old Hambledon man, to whose style of play is attributed the origin of the law l-b-w; No. 5, weighing about 2¾ lbs., *1800*; No. 6, marked on back with brass brads *1827*—belonged to John Bowyer, and weighed about 2¾ lbs.; Nos. 7 and 8 are in my possession, and are of present date: they weigh 2 lbs. 5½ ozs., and illustrate the plan of splicing, No. 7 in addition showing the whale-bone. Figures 1, 2, 5, 6, and 8, show the front and edge of bat, and figures 3, 4, and 7, front only.

ক্রিকেট-ব্যাটের ক্রমবিবর্তন।

দেখা যাচ্ছে, প্রথমাবধি খেলাটি ব্যাটসম্যান প্রধান। অর্থাৎ আইন করে ব্যাটসম্যানকে সতর্ক করতে হয়েছে সেই কবে! তার আগেই অবশ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছে ক্রিকেট।

বহু বিবর্তনের ফল যেমন আজকের মানবসভ্যতা, তেমনই ক্রিকেট। প্রথম দিকে ক্রিকেটের ব্যাট ছিল অনেকটা হকি-স্টিকের মতো। এবং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উইকেট ছিল দু-টি, যার মাথায় থাকত একটি মাত্র বেল।

ইংল্যান্ডের বাইরের মাটিতে প্রথম ক্রিকেট কোথায় খেলা হয়?

সেটা ৯ মে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ। জায়গাটি তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত আলেপ্পো শহর। হেনরি টোঙ্গো নামে ব্রিটিশ মিশনের দলভুক্ত একজন

ক্রিকেট মাঠ।

ডায়েরিতে লিখেছেন, প্রায় চল্লিশ জন ইংরেজ শহর ছেড়ে ঘুরতে বেরোল এবং একটা সুন্দর মাঠ দেখে krickett-সহ অন্যান্য খেলায় মেতে উঠল। সন্ধ্যে ৬ টায় তারা বাড়ি ফেরে।

এটিও লিখিতরূপে থেকে গেছে।

এরপর ব্রিটিশদের পিছু পিছু ক্রিকেট পৌঁছে যায় ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায়। এখন সেই অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডেই হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট। ■

ব্রিটিশদের পিছু পিছু ক্রিকেট পৌঁছে যায় ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায়। এখন সেই অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডেই হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট।

আল-আমীনের নানা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে দুঃস্থ পরিবারের কয়েক-শো মেধাবী ছেলেমেয়েও। আল-আমীনের আশ্রয় না পেলে হয়তো হারিয়ে যেত তারা। কেমন আছে এই কচিকাঁচারা, যারা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আল-আমীনের বিশ্বাস? নিজেই বলছে উনসানি ক্যাম্পাসের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

সহিদুল ইসলাম

অজানাকে জানার আনন্দ

- তোমার বাড়ি কোথায়?
- মুর্শিদাবাদের নওপাড়া গ্রামে। কান্দি মহকুমায়।
- কলকাতা থেকে যদি যেতে হয়, কীভাবে যাবে নওপাড়া?
- লালগোলা প্যাসেঞ্জারে গেলে খাগড়া স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে বাসে গোকর্ণ। গোকর্ণে পাওয়া যাবে মোটরভ্যান, তাতে করে দশ মিনিটের রাস্তা।
- আব্বার নাম? কী করেন তিনি?
- আব্বার নাম নজরুল ইসলাম। কাঠের ব্যাবসা করতেন। ২০০৯ সালে মারা গেছেন। ব্রেন ক্যানসারে। বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা হয়েছিল। দু-বছর। টাকাপয়সা সব শেষ হয়ে যায় চিকিৎসায়। কিছুই হয়নি। তখন আমি ক্লাস টুয়ে পড়ি।
- মা? কী করেন তিনি?
- মা সারজিনা বিবি। আশা প্রকল্পে কাজ করে। (মাথা নীচু, চোখ ভেজা-ভেজা, থেমে থেমে বলে) আমরা তিন ভাইবোন এতিম।
- ভাইবোনেরা কী করে?
- আমি সবার ছোটো। দাদা বিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। দিদি এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে।
- বাড়ির খরচ চলে কী করে?
- চার বিঘে জমি আছে। ভাগে চাষ হয়। ওটাই সম্বল। আর আশা প্রকল্প থেকে মায়ের বেতনটুকু।
- মিশনে আসার আগে কোথায় পড়তে?
- গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে। তারপর গোকর্ণ হাইস্কুলে ফাইভ, সিক্স। আমার তো সাইকেল ছিল না। অন্যের সাইকেলে যেতাম-আসতাম। কারো সাইকেল না পেলে সে-দিন যেতাম মোটরভ্যানে।
- রেজাল্ট কেমন হত?
- বরাবরই ফার্স্ট বয় ছিলাম।
- তারপর আল-আমীন মিশনে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলে। মিশনের খোঁজ পেলে কী করে?
- আমাদের গাঁয়ের দু-জন পড়ত মিশনে। যখন বেঁচেছিলেন, আব্বার খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে আল-আমীনে পড়ানোর। হয়তো ওই দুই ছেলেকে দেখে। আব্বা মারা যেতে, তাঁর সেই স্বপ্ন মরে যায়। তবু ক্লাস সিক্সে মা একবার চেষ্টা করেছিল। সেবার হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে আমি চান্স পাইনি। সেভেনে ফের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফর্ম তুলতে দেরি হয়, কোনোমতে শেষ দিনে ফর্ম জমা দিতে পেরেছিলাম। তারপর পরীক্ষায় বসি। চান্স পাই। আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল নবগ্রামে।
- চান্স পেয়ে তো খলতপুরে যেতে হয়েছিল ইন্টারভিউ দিতে। কার সঙ্গে গিয়েছিলে?
- মা, আমি আর আমার এক চাচাতো দাদা। সেই দাদা কাপড়ের

ব্যাবসা করে। হাওড়া আসতে হয় তাকে। সব তার চেনা। সেই নিয়ে গিয়েছিল খলতপুর। ইন্টারভিউ দিই। সেক্রেটারি স্যার আমাদের ফ্যামিলির সব কথা শুনে মাসে পাঁচশো নব্বই টাকা ফি ধার্য করেন আর আমাকে উনসানি ক্যাম্পাসে পাঠানোর কথা বলেন। ওটাই আল-আমীনের সবচেয়ে কম ফিজ। এই সুবিধাটা সেক্রেটারি স্যার না করে দিলে মিশনে আমার পড়া হত না।

বাড়িতে থাকলে খাওয়ার ঠিক থাকত না, পড়া তো দূরের কথা। শুধু খেলে বেড়াতাম। এখানে ঠিক সময়ে খাওয়া, ঠিক সময়ে পড়া— সব রুটিন মেনে। বিকেলে খেলা। সেটারও সময় বাঁধা— এক ঘণ্টা।

- তোমার আব্বার স্বপ্ন ছিল আল-আমীনে পড়ানোর। প্রথম যে-দিন মিশনের উনসানি ক্যাম্পাসে এলে ছাত্র হিসেবে, কেমন লেগেছিল?
- মনে হচ্ছিল ... (চুপ। মাথা নীচু। সম্ভবত কান্না লুকোবার জন্যে।) আব্বা থাকলে তো খুশি হতো।
- বাড়ির সঙ্গে মিশনের তফাতটা কেমন বুঝেছিলে?
- বাড়িতে থাকলে খাওয়ার ঠিক থাকত না, পড়া তো দূরের কথা। শুধু খেলে বেড়াতাম। এখানে ঠিক সময়ে খাওয়া, ঠিক সময়ে পড়া— সব রুটিন মেনে। বিকেলে খেলা। সেটারও সময় বাঁধা— এক ঘণ্টা।
- কী খেল?
- ক্রিকেট। ছোটো থেকেই ক্রিকেট খেলি।
- কোনটা ভালোবাস? ব্যাটিং না বোলিং?
- বেশি ভালো লাগে বল করতে।
- হস্টেলে তোমাদের রুমে কতজন ছেলে থাকে।
- বড়ো হলঘর। আমরা থাকি সেভেনের চোদ্দো জন আর সিক্সের পনেরো জন। আমাদের সঙ্গে থাকেন একজন রুম-টিচারও।
- কোন বইটি সবার পড়তে ইচ্ছে হয়?
- লাইফ সায়েন্স।
- লাইফ সায়েন্স। জীবন বিজ্ঞান কেন?
- বিভিন্ন জীবজন্তুর কথা জানা যায়। নানা রোগ, জীবাণু— এসবের কথা জানতে পারি।
- এসব জেনে কী হবে?
- কীভাবে কী হয়, কোন রোগের কী প্রতিকার— জানতে পারি। অজানাকে জানার আনন্দে পড়তে থাকি। আরও পড়লে আরও জানতে পারব।
- আর কী পড়তে ভালো লাগে?
- এ ছাড়া ইতিহাস, অঙ্ক।
- ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে কেন?
- আগেকার মানুষ, রাজা-বাদশা, তাঁদের সংস্কৃতির পরিচয় পেতে পারি।
- কেন? অতীতের কথা জেনে আমাদের কী লাভ?
- আমরা তো এসেছি সেখান থেকেই। তাই জানতে হবে। জানলে সুবিধে হবে আমাদেরই। ভুলভ্রান্তিগুলো শুধরে নিতে পারব আমরা।
- ইংরেজি পড়তে কেমন লাগে?
- শক্ত মনে হয়। কিন্তু ইংলিশ গ্রামার ভালো লাগে। মিশনে ইংরেজি ভালো পড়ানো হয়। আমাদের গোকর্ণে এরকম পড়ানো হত না। তাই ফাইভ থেকে মিশনে যারা পড়ছে, তাদের সঙ্গে এখনও পেরে উঠছি না। তবে স্যাররা খুবই সাহায্য করেন।
- কীরকমভাবে সাহায্য করেন?
- যেটা বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না বুঝব, বোঝানোর চেষ্টা করেই যাবেন। এ ছাড়া প্রতি রবিবার আমাদের সাবির স্যার ইংলিশের কোচিং নেন।
- এ তো গেল ইংরেজির কথা? অন্য বিষয়?
- যখন যে-সাবজেক্ট পড়ি, সেই সাবজেক্ট-টিচার আমাদের কাছে থাকেন। না বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দেন।
- আল-আমীনে সারাদিন রুটিন বাঁধা। হস্টেলে থাকতে থাকতে বাড়ির জন্যে মন খারাপ করে না? যখন বাড়ি যাও, গাঁয়ের বন্ধুদের দেখে মনে হয় না— ইস্, এদের ছেড়ে কোথায় পড়ে আছি হস্টেলবন্দি হয়ে?
- প্রথম দিকে খুবই মন খারাপ করত। তারপর দেখলাম, মিশনে না এলে এমন পড়াশোনা হত না আমার। কিছু পেতে গেলে তো কিছু ছাড়তেই হয়।
- রুমে যখন একা থাক, কী কর? হস্টেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাক? কী দেখ? গাছপালা?
- আমার বেডে জানালা নেই। পাশের বেডেই আছে। সেখান থেকে রেললাইন দেখা যায়। ট্রেন দেখি।
- দূরপাল্লার ট্রেন যখন গমগম করে চলে যায়, কী মনে হয়?
- দারুণ লাগে। সরু দুটো লাইনের ওপর অত বড়ো একটা ট্রেন কী করে এত জোরে যায়, দেখে আশ্চর্য লাগে।
- এরকম একটা দূরপাল্লার ট্রেনে তুলে দিলে কোথায় যেতে চাইবে তুমি?
- সুন্দর একটা জায়গায়। যেখানে সবকিছুই সুন্দর— বাড়িঘর, গাছপালা, মানে চমৎকার পরিবেশ থাকবে যেখানে, সেরকম একটা জায়গায়। আর মানুষজন হবে খুব ভালো।
- তুমি তো মিশনে আসার আগে ফার্স্ট বয় ছিলে। এখানে এসে রেজাল্ট কেমন হচ্ছে?
- ফার্স্ট টার্মে পেয়েছি ৭১ শতাংশ, সেকেন্ড টার্মে ৬৯ শতাংশ।
- এত কম নম্বর?
- প্রথম বছর তো। জানতাম না কেমন করে ভালো উত্তর লিখতে হয়। তবে অ্যানুয়ালে আশা করছি ৮০ শতাংশ পাব। আর একটা সমস্যা হয়েছিল আমার। লাইফ সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স আর অঙ্কতেও কিছু প্রশ্ন ছিল ইংরেজিতে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই, জেনেও ঠিক উত্তর দিতে পারিনি।
- বড়ো হয়ে কী হতে চাও?
- (এতক্ষণে মুখে লাজুক হাসি সহিদুলের) ডাক্তার হতে চাই। ■

এবারের পাতায় রয়েছে খলতপুর ও পাঁচুড় ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের ছবি ও লেখা।

মায়াজাল

মহাইমিনুল বিশ্বাস
নবম শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

খেজুর গাছের রসের ভাঁড়ে
দিচ্ছে চুমুক দোয়েল পাখি,
হারায় দূরে লালমাটির পথ
কেবল আমি চেয়ে থাকি।

নকশিকাঁথা জড়িয়ে গায়
ঘরগুলো সব শীতকাতুরে,
দুধসাদা রং বকের পাখায়
মিঠেল রোদ যে যাচ্ছে উড়ে।

রংতুলিতে গাছবালিকা
ফুল কি আঁকে উঠানেতে,
নবান্নকে করবে বরণ
সোনা ধানের আঁচল পেতে।

শীতের বিকেল আকাশ নামে
সর্ষে খেতের প্রান্তরেখায়,
তার সে খুশি ছড়িয়ে পড়ে
কুড়োতে কে যাবি রে আয়।

মাহামুদা সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

মুরসালিন মোল্লা
একাদশ শ্রেণি
খলতপুর ক্যাম্পাস

শুকতারা

মহম্মদ হাসানুজ্জামান
দ্বাদশ শ্রেণি, পাঁচুড় ক্যাম্পাস

ভোরের তারা—
নিঃসঙ্গতায় ভরপুর,
হারাতে থাকে সঙ্গীরা তার
আলোর অন্ধকারে।
ব্যস্ততম এই একাকী শহরের মাথায়
জ্বলজ্বল করছে, শতাব্দী জুড়ে
নিঃস্বার্থভাবে।

স্তিমিত হয় শহরের কোলাহল,
জ্বলে ওঠে নিঃসঙ্গতা,
নিস্তব্ধতার বাতি
পুনরায়—

আচ্ছা, মানুষের জীবনও কি তাই?

পানকৌড়িমা

সেখ মিনান আহমেদ
পঞ্চম শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

পানকৌড়ি পানকৌড়ি পানকৌড়িমা,
পুকুরপাড়ে বসে কেন সঙ্গে নিয়ে ছা?
আগে সাঁতার শিখিয়ে নিয়ো—
তবেই জলে নামতে দিয়ো,
নইলে তলায় তলিয়ে যাবে
হদিশ পাবে না।

ডিটেক্টিভ র‍্যাক

রাজীব আলি খাঁন
একাদশ শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

সুন্দর আবহাওয়া। বেশ হালকা ঠান্ডা বাতাস বইছে, টেবিলে চায়ের কাপ থেকে গরমটা বের হচ্ছে। সেটা মুখের কাছে নিতে ভালোই লাগছে। অর্থাৎ চায়ের স্বাদ ও অবসাদ দুইই চলছে। হঠাৎ সামন্ত হাঁক দিল, "দাদা ফোন বাজছে, তাড়াতাড়ি এসে তোলো।" চেয়ারটাকে ঠেলে রুমে গিয়ে ফোন তুলে বললাম, "হ্যালো, মিস্টার র‍্যাক বলছি, আপনি কে বলছেন?"

সেদিক থেকে চাপা কর্কশ কণ্ঠস্বর এল, "আমি শ্রীধর আচার্য বলছি স্যার। আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। মানে স্যার, আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। তাই ফোন করলাম।"

— কী সমস্যায় পড়েছেন মিস্টার আচার্য।

— আজ্ঞে, সেটা আমি আপনাকে ফোনে বলতে পারছি না স্যার। দয়া করে যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন।

— কোথায় দেখা করব বলুন?

— আজ্ঞে, এম এল লেনের দক্ষিণ প্রান্তে যে পোড়ো বাড়ি আছে, তার পাশে।

— ঠিক আছে। কখন দেখা করব?

— স্যার, মানে আমি একটু ব্যস্ত আছি তো। দয়া করে আজ বিকেলে।

— ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

লোকটার গলার স্বর শুনে মনে হল, কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কোনো বিপদ তাকে তাড়া করছে। দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট। আমি গাড়িটা নিয়ে এম এল লেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, তখন আকাশে সূর্য অর্ধেক লাল। মোটামুটি হালকা পরিবেশ। গাড়িটা পোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড় করালাম। বাড়িটা ভাঙা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ইটগুলি খসে পড়ছে। আমি গিয়ে লোকটাকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ আমি গুলি চালাবার আওয়াজ শুনলাম। আওয়াজটা বাড়ির পিছনের প্রাচীরের কাছ থেকে এসেছে। সেটা আমি বুঝতে পারলাম। আমি দ্রুত ছুটে গেলাম। দেখলাম, একটা লোক, সে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি তাকে গিয়ে বললাম, "আপনি মিস্টার আচার্য?" সে বিদ্ধ গলায় বলল, "হ্যাঁ স্যার।"

— তোমার এই হাল কে করল?

— স্যার, স্যার, আমার পকেটে একটা ...

আমি পকেটের ভেতর হাত দিয়ে দেখলাম এবং বের করলাম একটা চাবি। প্রথমে অবাক হই, তারপর তার জামার পকেট সার্চ করলাম। ভালোই হল, সেই লোকটার ঠিকানা পেয়ে গেলাম। বাড়ি কুমোরটুলি ৩২ এন জি রোড। আমি তারপর অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে ডেড বডি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে দিলাম।

পরের দিন সকাল ৮ টায় আমি এন জি রোডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশে লোককে জিজ্ঞাসা করে তার বাড়ির খবর জেনে নিলাম। বাড়ির সামনে গিয়ে আমি দেখলাম, দরজায় তালা মারা। হয়তো বাড়িতে কেউ নেই। আমি আশপাশে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, বাড়িতে ও একাই থাকে।

তারপর আমি বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে তার ঘর সার্চ করতে লাগলাম। অনেক খোঁজার পর আমি একটা লকার পেলাম। তারপর যে-চাবিটা আমি মিস্টার আচার্যের পকেট থেকে পেয়েছিলাম, সেটা দিয়ে তালা খুললাম। ভেতরে যা দেখি, তা দেখে আমি প্রথমে অবাক হয়ে যাই। তারপর লকার নিয়ে আমার বাড়ি ফিরলাম।

আমি প্রথমে ভেবে পেলাম না, এই জিনিসগুলো এনার কাছে এল কী করে? অনেক চেস্টার পর সেই লকারের ওপরের একটি খাপ থেকে আমি একটা কাগজ উদ্ধার করলাম, সেটা দেখে আমি অবাক হলাম। সেই কাগজে একটা রাজবাড়ির ছবি আঁকা আছে, যার ঠিকানা নীচে ছোটো করে দেওয়া। সেটা পড়ে বুঝতে পারলাম— ২৮ গলি নম্বর ২৯ রামেশ্বর। আমি প্রথমে বুঝতে পারি মিস্টার আচার্যের পোশাক দেখে। পঞ্চান্ন বছর বয়সের মাঝারি হাইট আর রাজশাহি পোশাক।

আমি পরের দিন সকাল ৭ টায় রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। অবশ্য আগের দিন রাতে আমি লাইব্রেরি গিয়ে সেই রাজবাড়ির সমস্ত তথ্য জানতে পারি।

রাজবাড়িটা প্রায় বিরাশি বছরের পুরোনো। রাজা ফরিদ মিয়াঁ ছিলেন কর্ণধার। সেখান থেকেই জানতে পারি রাজার বংশধররা নাকি এখনও বেঁচে আছেন।

আমি রাজবাড়িতে গিয়ে আশপাশে জিজ্ঞাসা করে খবর পাই, এই রাজবাড়ি ধর্মা ডিলার্সের আয়ত্বে আছে। তারপর আমি ধর্মা ডিলার্সের ম্যানেজার সুকান্ত আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম,"আজ্ঞে, একটা কেস নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম।"

মিস্টার আগরওয়াল বললেন, "বলুন বলুন।" তিনি বেশ হতভম্ব হয়েই বললেন।

— বলছি যে, মিস্টার আচার্যকে চেনেন?

— কেন, কী হয়েছে? প্রায় দু-দিন থেকে ও আসছে না।

— উফ! আপনি জানেন না। কে ওকে খুন করে দিয়েছে।

সৈয়দ মহম্মদ তামিম
ষষ্ঠ শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

— হোয়াট! কী বলছেন আপনি? কে করেছে?

— সেই জন্যই তো আপনার কাছে এলাম। বলছিলাম, এখন যে-রাজবাড়িটা আপনাদের আয়ত্বে আছে, সেটার মালিক কে?

— দেখুন মিস্টার র‍্যাক, সেই খবর আপনাকে বলব ঠিক আছে, কিন্তু আমি যেন, মানে ...

— হা! হা! হা! দেখুন, দেখুন মিস্টার আগরওয়াল, তা আপনি কেন ফাঁসবেন।

— আসলে এর মালিক হলেন শশীলাল রায়। তিনি এন এস বি রোডের ২৩২ নম্বর ঘরে থাকেন।

— অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার আগরওয়াল। আমি চলি। তারপর আমি গিয়ে মিস্টার রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম।

— কী ব্যাপার মিস্টার রায়, আপনি তো নিশ্চয় মিস্টার আচার্যকে চেনেন।

— "হ্যাঁ, চিনি বই কী!" তিনি বেশ হতভম্বের সঙ্গে বললেন।

আমি বললাম, "সে মারা গেছে?"

— কী! কে মেরেছে?

— সেই রাজবাড়ির শেয়ারে আপনার সঙ্গে কে আছেন?

— আজ্ঞে কী, রাজবাড়ি?

— আহা! ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি সমস্ত খবর নিয়ে এসেছি।

— স্যার, আসলে আমার সঙ্গে রবি দাস আছে। কিন্তু, আপনি এই খবর নিয়ে কী করবেন? আপনি রবি দাসের ঠিকানা দিন।

আমি তক্ষুনিই রবি দাসের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, বাড়িতে কেউ নেই। আমি তখনই বুঝতে পারলাম, পাখি জালে পড়েছে।

আমি রাতের মধ্যেই রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমি বুঝতে পেরেছি, মিস্টার দাস রাজবাড়িতেই লুকিয়ে থাকবে।

রাজবাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আওয়াজ পেলাম। আওয়াজটা ওপর থেকেই এসেছিল। প্রায় অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আমি ওপরে গিয়ে দেখলাম, মিস্টার রায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার রায়, বলুন, মিস্টার দাস কোথায়?"

সে বলল, "ওদিকে।"— বলে ডান দিকের ঘরের দিকে দেখাল।

আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে যা দেখলাম, তা হতভম্ব হতেই হয়। মিস্টার দাস আর কেউ নয়, ধর্মা ডিলার্সের ম্যানেজার মিস্টার আগরওয়াল। বললাম, "থামুন আগরওয়াল, আপনার সব কেস আমি জানতে পেরেছি।"

— আমি কিছু করিনি।

— সে তো আমি আগেই জানতে পেরেছি।

— মানে?

— আপনি মিস্টার আচার্যকে ব্ল্যাকমেল করতেন, যাতে আপনাকে জিনিসটা দিয়ে দেয়।

সে আমার দিকে গুলি তাক করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক বের করে তার পায়ে গুলি মারলাম। সে তখনই মাটিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, "মিস্টার আচার্যের বাড়ি থেকে যে-লকার পেয়েছিলাম, সেখান থেকে সব খবর পাই।" সে কেঁদে কেঁদে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সব খুন করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই মিস্টার আচার্য আমার পূর্বপুরুষের সমস্ত সম্পত্তি একাই আত্মসাৎ করবে বলছিল। আর আমি সেটা কী করে হতে দিতাম। সেটা আমার পূর্বপুরুষের। সমস্ত সোনাদানা, হিরা ও এখানেই লুকিয়েছে। আর আমি সেটা খুঁজতে এসেছি।"

— বাহ্, অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার আগরওয়াল, আপনি নিজেই আপনার কেস মেটালেন। চলুন, জেল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটি শুকনো পাতা

মীর মাসুদুর রহমান
একাদশ শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

দিনটা ছিল শনিবার। আমি যখন আনমনা হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা ঢিলগুলিতে লাথি মারতে মারতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, তখনই হঠাৎ আমার মারা একটি ঢিল একটি গাছে লাগল এবং গাছ থেকে একটি শুকনো পাতা চরকির মতো হেলতে-দুলতে একবার এদিক একবার ওদিক করতে করতে পড়ে গেল। এই দৃশ্যটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। দৃশ্য দেখার পর আবার আমি বাড়ির দিকে যাত্রা দিলাম। হঠাৎ আমার কানে কোথা থেকে একটা কান্নার আওয়াজ এল, আমি পেছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। কান্নার আওয়াজ জোরালো হল, চারিদিক খুঁজে দেখলাম, কেউ নেই, আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?" তখনই আমার নজর সেই গাছটির দিকে পড়ল, যেটিতে আমি ঢিল মেরেছিলাম, আর যা দেখলাম, সেই শুকনো পাতাটি, যেটি তখন চরকির মতো পড়ছিল, সেটা কাঁদছে। তার কাছে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কাঁদছ কেন?" তখন পাতাটি বলল, "বাবা, এই কাঁদার পিছনে অনেক দুঃখ জমে আছে, শুনতে পারবে?" পারব! অবশ্যই পারব। "তাহলে শোনো।"

কথাটি সেই বসন্তের সময়, যখন আমি ছিলাম রূপ ও লাবণ্যে ভরা একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত ও গাঢ় সবুজ পাতা। এই যে গাছটা দেখছ, এই গাছের সবচেয়ে সুন্দর পাতা ছিলাম আমি। অন্যরা আমাকে দেখে হিংসা করত, তারাও সুন্দর ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম সবচেয়ে সুন্দর। যত দিন গেল, আমি পূর্ণাঙ্গ হলাম, সবার নজর আমার ওপর পড়ল। আমি এতে আনন্দিত হলাম। কিছুদিন পর আমার সঙ্গে পরিচয় হল রশ্মির। কিছুদিন পর আমার সাথে ওর বিবাহ সম্পন্ন হল, কিন্তু বিবাহের পর সংসারে অভাব দেখা দেয়, তাই সংসার চালাতে ধার-দেনা করতে হল, আরও কত কষ্ট। আমি ধার করেছিলাম CO_2, খনিজ লবণ, জলদের কাছে। কিছুদিন পর আমার দেহের ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় আমি শর্করাকে তৈরি করলাম, যা গাছটিকে দিল শক্তি। আমি বহুদিন গাছটিকে শর্করা দিলাম, গাছটি আরও শক্তি পেল, মজবুত হল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার রূপ ও লাবণ্য কমতে লাগল। আমি আর শর্করা উৎপন্ন করতে পারলাম না, পারলাম না গাছটিকে শক্তি দিতে। ধীরে ধীরে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ থাকল না আমার সঙ্গে। আমি গাছটির কাছে বোঝা হয়ে গেলাম, যাকে আমি বহু কষ্ট করে বড়ো করলাম। সেই গাছটিই আমাকে ধিক্কার জানাল, অপমান করল এবং এই গাছ ছেড়ে চলে যেতে বলল। আর আজকে আমাকে তাড়িয়ে দিল, তাড়িয়ে দিল আমাকে। এই অবস্থা শুধু আমার একার নয়, শত শত শুকনো পাতার।

জুনায়েদ হোসেন মণ্ডল
পঞ্চম শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

কথাগুলি শুনে আমার চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারপর চোখ মুছে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম, কারণ, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু ছিল না। আর আমি তখন বুঝতে পারলাম, তার হেলতে-দুলতে পড়াটা ছিল তার আর্তনাদ ও হাত-পা তুলে সেই গাছে ফেরার প্রবল চেষ্টা।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্ট পরিচালিত

আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কল

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতির প্রতিষ্ঠান

২০১৪-র মেডিকেলে সফলদের কয়েক জন

৩২
উমর আলি

৩৩
সাজিদ আহমেদ

৩৪
ইনজামামুল হক

৩৮
জোহেব মণ্ডল

৪০
মহ. সাজিদ মল্লিক

৫১
সাহারুখ হোসেন

৫৮
তাবাসসুম খাতুন

৬৫
বুলবুল সেখ

৭৫
সেখ হাসানুর জামাল

৮২
মেহ্জাবীন পারভিন

৯০
মহ. সামিম আক্তার

৯৫
মতিউর রহমান

২০১৪-র ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফলদের কয়েক জন

৫৯৯
তারিক আহমেদ

৮২১
মহ. হাসেম আলি

১০৫১
আবু তাহির

১২৩০
সেরু মোমিন

১২৪১
আমির সোহেল

১২৯১
সাইফুল হক

এ-বছর মেডিকেলে ২৫০০-এর মধ্যে ২৩১ জন এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫০০০-এর মধ্যে ১৫৮ জন র‍্যাঙ্ক করেছে।

● WBJEE, AIPMT, JEE (MAIN)-এর জন্য নীচের কোর্সগুলিতে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি চলছে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমেই পড়ানো হবে।

❑ ১ বছর ও ২ বছরের ক্লাসরুম কোচিং কোর্স। ❑ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কোর্স। ❑ পোস্টাল টেস্ট সিরিজ কোর্স। ❑ মক টেস্ট সিরিজ কোর্স।

॥ চাকরির পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতির জন্য নীচের কোর্সগুলিতে ভর্তি চলছে ॥

❖ West Bengal Civil Services Examinations (WBCS)
❖ School Service Commission/Madrasah Service Commission (TET & Subject)
❖ Primary TET ❖ Combined Courses (Misc., Staff Selection Commission, Clerkship, Rail etc.)

সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ২২২৯ ৩৭৬৯; ৯৪৩৪৬ ১৭১৪৫
রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৯১৪৩০ ৯২৯২১; ৮৩৭৩০ ৫৮৭০৪
website: www.alameenmission.org, e-mail: kolkata@alameenmission.in

A great place for your kid to grow

Al-Ameen Mission Academy, Milonmore

(Residential English medium institution for Muslim boys)

Milonmore, Pradhannagar, Siliguri, Ph.: 097322 54976

A Unit of Al-Ameen Mission Trust

Imparting Modern Education with Islamic values

- Application Forms are available for admission to classes V, VI, & VII.
- Last date: 27 March 2015.
- Admission Test : 29th March 2015.

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Phone: 083730 58749

Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Phone: 033-2229 3769